বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে

অনেক অনেক দিন আগে

অনেক—অনেক দিন আগে এক শীতের সকালবেলা এক গরীব কাঠুরে বনে জ্বালানী কাঠ আনতে গিয়েছিল। সেদিন বেশ বরফ পড়েছে, পাইন গাছের চুড়ো পর্যন্ত বরফে ঢাকা। লোকটির জামা-কাপড় বিশেষ কিছুই ছিল না। কাজেই ঠাণ্ডায় তার হাড় পর্যন্ত যেন জমে যাচ্ছিল।

একটু গরম পাবার জন্য সে একগোছা কাঠ জ্বালাবে ঠিক করল। বরফ পড়ে পড়ে কোমর অবধি উঁচু হয়ে গেছে। সব কাঠই বরফে চাপা পড়ে গেছে।

বেচারা খুঁড়তেই লাগল, খুঁড়তেই লাগ্‌ল, হঠাৎ ঠক্ করে একটা আওয়াজ হ'ল। সে তো আরও জোরসে হাত চালাতে লাগ্‌ল। অবশেষে সে কি পেল জান?—বল তো দেখি?—একটা খোদাইকরা সুন্দর ঝাঁপি। কাঠুরে ভায়া তো মহা খুশি, নিশ্চয়ই ওতে ধনদৌলত আছে।

"দাঁড়াও, দাঁড়াও," সে নিজের মনকে বলতে লাগল, "চাবিটা কোথায়? ঝাঁপি যখন রয়েছে চাবিও একটা ঠিক থাক্‌বে।"

চাবি খুঁজে মিল্‌ল, সে ঝাঁপিটা খুলতে লাগ্‌ল।

তোমরা চুপ করে বস, ততক্ষণ ও ঝাঁপিটা খুলুক।

দেখা যাক কি আছে ওটার মধ্যে......

এই তো পাওয়া গেছে। কাঠুরে বন্ধু যে একেবারে দিশেহারা—আর শীত লাগছে না, ক্ষিধেও নেই, কাজকর্মও বাতিল......ব্যাপার কি? কি ছিল এমন ঝাঁপিতে?

এস, আমরা ডালাটা খুলি......খু...লি......

ভল্লুক-কর্ণ

সে আজ বহুদিনের কথা। এক জমিদার তাঁর বাড়ির এক দাসীকে পাঠিয়েছিলেন কার্পাস তুলতে। কড়া হুকুম ছিল সন্ধ্যা পর্যন্ত নাগাড়ে কাজ করবার, দুপুরে খাবার জন্য বাড়ি ফেরা ছিল বারণ, বেকাজে এক মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না। জমিদার-পত্নী দাসীটিকে দই দিয়ে তৈরি খানিকটা খাবার, এক টুক্‌রো রুটি আর একটা চড়াইপাখির ঠ্যাং দিয়েছিলেন। মেয়েটি কার্পাস তুলতেই লাগ্‌ল, তুল্‌তেই লাগ্‌ল—শেষে বড়ই ক্লান্তি লাগ্‌ল তার। একটা ছোট ওক্‌গাছের তলায় একটু বিশ্রাম করতে বসামাত্রই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

এমন সময় হয়েছে কি বন থেকে একটা ভাল্লুক বেরিয়ে এসেছে। এমন সুন্দরী মেয়ে দেখে সে তো খপ্‌ করে তাকে ধরে ফেল্‌ল। তারপর তাকে একেবারে নিজের আস্তানায় এনে হাজির করা আর এমন কি শক্ত। বেচারী মেয়েটি আর কি করে—বাধ্য হয়ে তাকে ভাল্লুকের গুহায়ই দিন কাটাতে হল।

কিছুদিন পরে তার এক ছেলে হল—গায়ে তার ভীষণ জোর। তাকে দেখতে ঠিক সাধারণ ছেলেদের মতই। কেবল তার কান দুটো হল মস্ত আর খাড়া খাড়া—ঠিক ভাল্লুকের মত। কাজেই তার নাম রাখা হল লাচাউসিস্‌ যার মানে ভল্লুক-কর্ণ।

ছেলেটি বড় হতে লাগ্‌ল দিনে দিনে নয় যেন ঘণ্টায় ঘণ্টায়।

এদিকে লাচাউসিসের মায়ের মন বড় খারাপ তার বাপ-মায়ের কথা ভেবে ভেবে। ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে প্রায়ই বলে, "বড়, বড়, লাচাউসিস আরও বড় হ! গায়ে জোর কর। তোর সঙ্গে আমি আমার বাপমার কাছে ফিরে যাব—আমার দেশের লোকের কাছে ফিরে যাব।"

শীকারে যাবার আগে ভাল্লুকটা গুহার মুখে একটা বিরাট পাথর চাপা দিয়ে যায়। লাচাউসিস্ ঐ পাথরটার উপর তার শক্তি পরীক্ষা আরম্ভ করল। প্রথম প্রথম কাঁধ দিয়ে ঠেলে তবে ওটাকে নড়াতে পারত সে, এখন এক হাতেই পাথরটা ঠেলে দিতে লাগ্‌ল। মাকে জিজ্ঞাসা করল সে, "মা, ওমা! বাড়ি ফিরে যাবার সময় কি হয়নি?"

মা উত্তর দিল, "না, এখনও নয়! যতদিন না তোর পা শক্ত হচ্ছে ততদিন নয়। দূরে ঐ যে ফারগাছ রয়েছে, দেখি তো কেমন হাতের জোর, ওটা গোড়া-সুদ্ধ তুলে ছোঁড়্ তো আকাশের দিকে।"

লাচাউসিস গাছটা উপড়ে ফেল্‌ল বটে কিন্তু উপরের দিকে ছুঁড়তে আর পারল না।

দিন কাট্‌তে লাগল জলের মত আর লাচাউসিসের গায়ের জোরও বাড়তে লাগ্‌ল।

শেষে একদিন গুহা থেকে বেরিয়ে এল সে। ফারগাছটা ভাল করে দেখে শুনে মারল এক টান। শিকড়শুদ্ধ বেরিয়ে এল গাছটা। লাচাউসিস ছুঁড়ে দিল উপরের দিকে খুব জোরে। মাটিতে নেমে আসতে অনেক সময় লাগ্‌ল গাছটার। সোজা হয়ে পড়ছিল বলে প্রায় অর্ধেকটা ঢুকে গেল একেবারে

মাটির মধ্যে। লাচাউসিস তো আহ্লাদে আটখানা। লোকালয়ে ফিরে যাবার সময় এতদিনে তবে হয়েছে।"

মাকে সঙ্গে নিয়ে সে বন পেরিয়ে উপস্থিত হল তার মামার বাড়ি। এদের দেখে কি আনন্দ যে সকলের হল তা আর কি বল্‌ব। কিন্তু লাচাউসিস এই বিরাট পৃথিবীতে একা বেরিয়ে পড়ল কাজের খোঁজে।

যেতে যেতে পথে সে দেখতে পেল কতকগুলো লোক মাটিতে কি যেন আছড়াচ্ছে। কাছে গিয়ে সে প্রশ্ন করল, "তোমরা কি করছ, ভাই ?"

দলের সর্দার ওর দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল, "এঃ হে, ভল্লুক-কর্ণ, তুমি দেখছি কিছুই জান না। আরে ওরা ঐ কাঠের পাটার উপর রাইগুলো আছড়াচ্ছে।"

—"ও আবার কি রকম ? দাঁড়াও, আমি ওদের একটু সাহায্য করি। আমারই উপযুক্ত কাজ বোধহয় এটা।"

এই না বলে সে দুইটানে একটা ফারগাছ আর একটা ওকগাছ তুলে না ফেলে কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা কাঠের পাটাতন তৈরি করে ফেল্‌ল। যারা এতক্ষণ কাজ করছিল তারা তো হাঁ হয়ে দেখতে লাগ্‌ল। এক ! দুই ! সব রাইগুলোর খোসা ছাড়ানো শেষ। কেবল চারপাশে ধুলোর একটা ঝড় বয়ে গেল যেন।

সর্দার ভাবল, "বাঃ, লোকটার গায়ে তো বেশ জোর।"

লাচাউস্সিসকে সে বল্‌ল, "এ তো বাবা তোমার যোগ্য কাজ নয়। তোমার গায়ে এত জোর! বনে যাও, এর চেয়ে ভাল কাজ মিলবে। শীতের জন্য জ্বালানী কাঠ নিয়ে এস তো দেখি।"

ঐ বনে আবার সে সময় অনেক শয়তানের বাচ্চা থাকত। লাচাউসিস যেই মাত্র বনে ঢুকল অমনি সেগুলো মহা উৎপাত শুরু করে দিল—কেউ একটা গাছ উপড়ে ফেলে, কেউ বা মাথায় একটা গাছের ডাল দিয়ে বাড়ি মারে আবার কেউ এক ধাক্কা মেরে লাচাউসিসকে দেয় গর্তে ফেলে। সে বেচারী তো রেগে আগুন। শেষে সে দুটোকে পাকড়াও করল, তারপর জোরসে মাথা দুটো দিল ঠোকাঠুকি করে। তারা তো 'আর করব না, ছেড়ে দাও' বলে চেঁচামেচি শুরু করল। মুক্তিপণ হিসাবে তারা কিছু দেবেও বল্‌ল।

"আমায় দু বস্তা সোনা এনে দে, তারপর যেখানে খুশী মরগে যা," বল্‌ল লাচাউসিস।

ওরা তো তাতেই রাজী। লাচাউসিস একটাকে আটকে রেখে দিল, অন্যটা দৌড় দিল সোনা আনতে। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে তো সোনা এসে উপস্থিত। ছাড়া পেয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল ওরা। লাচাউসিসও এক এক করে সব গাছগুলো উপড়ে ফেল্‌ল তারপর গাড়ি বোঝাই করল সেগুলো। কিন্তু অমন ভারী গাড়ি ঐ ঘোড়া টানবে কেমন করে। কোন উপায়ই নেই, কাজে কাজেই লাচাউসিস নিজেই গাড়ি টেনে নিয়ে চল্‌ল।

টানতে টানতে উঠোনের মাঝখানে গাড়িটা উলটে ফেলে সে সর্দারকে বললে, "এই আপনার জ্বালানী কাঠ।"

সর্দার তো হতভম্ব। এখন আবার সব লোক লাগিয়ে ঐ পাহাড় সমান কাঠ কাটতে হবে, কদিন লাগবে কে জানে?

লাচাউসের দিকে তাকিয়ে সর্দার বল্‌ল, "এঃ হে, ভল্লুক-কর্ণ! উনুন ধরাতে গেলে কাঠগুলো চিরে টুকরো টুকরো

করতে হবে। তুমি তো তার কিছুই জান না। এসব তোমার দ্বারা হবে না দেখা যাচ্ছে। তোমার গায়ে যা ভীষণ জোর! এখন সরে পড়।"

সুতরাং লাচাউসিস পথে বেরিয়ে পড়ল, কাঁধে দুই ঝোলা ভর্তি সোনা। একবস্তা সোনা সে মাকে দিল। আরেক থলি সে গ্রামের কামারকে দেবে বল্‌ল যদি কামারভায়া তাকে একটা মোটা লোহার ডাণ্ডা তৈরি করে দেয়। পথে কাজে লাগতে পারে তো ওটা।

কামার একটা ডাণ্ডা নতুন করে তৈরি করল। দাম তার দশ মোহর। লাচাউসিস হাতে নিয়ে দেখল বড্ড হাল্কা সেটা। সে ডাণ্ডাটাকে খুব জোরে আকাশের দিকে ছুঁড়ে মারল—এত উঁচুতে যে সেটা পড়তে না পড়তে দু কলসী জল শেষ হয়ে গেল ঢালতে ঢালতে। লাচাউসিস তাঁর ডান হাতের কড়ে আঙ্গুলটা বাড়িয়ে দিল। ডাণ্ডাটা সেই আঙ্গুলে লেগে একেবারে বেঁকে দুভাগ হয়ে গেল। লাচাউসিস ত্রিশ মোহর দামের এর থেকেও ভাল একটা ডাণ্ডা চাইল। নতুন ডাণ্ডাটাও সে এমনি পরীক্ষা করে দেখল তার কাজ চলবে। এবার সে যেদিকে দুচোখ যায় সেইদিকেই পা বাড়াল।

যেতে যেতে লাচাউসিসের দেখা হঠাৎ এক দৈত্যের সঙ্গে।

—"কে হে তুমি ?" লাচাউসিস জিজ্ঞাসা করে।

—"আমি বনবিদারণ।"

—"বটে, কি করা হয় তোমার ?"

—"আমি ফার আর পাইন গাছ উপড়ে ফেলতে পারি," বলে বনবিদারণ।

—"তাই নাকি, দেখি তো কেমন।"

যেমন বলা তেমনি কাজ। বনবিদারণ এক একটা গাছ ধরে আর পাটগাছের মত শিকড় শুদ্ধ তুলে ফেলে। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে দৈত্যটা সব পাইনগাছ আরও অন্য সব গাছ উপড়ে ফেল্‌ল—চারিপাশে কেবল ন্যাড়া মাটি আর ধুলো।

বনবিদারণ বল্‌লে, "কেমন, এখানে এখন রাই পোঁতা যাবে, গমও হবে।"

লাচাউসিস বল্‌ল, "ঠিক, ঠিক, তুমি তো খুব ওস্তাদ দেখছি। এস, আমরা একসঙ্গে যাই।"

তারা দুজনে একসঙ্গে চল্‌ল।

আবার যেতে যেতে দেখা আরেকটা দৈত্যের সঙ্গে—এ আবার আরও বড়।

—"তুমি কে হে?" লাচাউসিস জানতে চাইল।

—"আমি পাহাড়পাতন", দৈত্যটা উত্তর দেয়।

—"হুঁ, তা কি করা হয় তোমার?"

—"আমি পাহাড় নড়াতে পারি, সরাতেও পারি।"

—"বটে, দেখি কেমন।"

পাহাড়পাতন একটা পাহাড়ের কাছে গিয়ে পা বেঁকিয়ে মারল জোর টান। পাহাড়টা নড়ে উঠল। আরও জোর, আরও জোর। ব্যাস্, আগে যেখানে পাহাড় ছিল, এখন সেখান থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

—"কেমন, দেখলে তো। এখন এখানে বাড়িঘর দোর করা যাবে," বলে পাহাড়পাতন।

—"ঠিক, ঠিক। তুমিও দেখছি ওস্তাদ লোক। চল না আমাদের সঙ্গে।" লাচাউসিস বলে। এমনিভাবে তিনজন

—লাচাউসিস, বনবিদারণ আর পাহাড়পাতন চলতে লাগল একসঙ্গে—দূরে, আরও দূরে।

চলতে চলতে শেষে সন্ধ্যা হয়ে গেল। খেতে হবে তো, শুতে হবে তো। বনবিদারণ কতকগুলো গাছ উপড়ে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করল, পাহাড়পাতন মাটিটা চেপে চেপে সমান করে দিলে, লাচাউসিস একটা কাঠের বাড়ি তৈরি করে ফেল্‌ল। তিন বন্ধুতে সেখানে আরামে রাত কাটালে।

সকাল হতে লাচাউসিস পাহাড়পাতনকে নিয়ে শিকারের সন্ধানে বেরল, বাড়িতে রইল বনবিদারণ রান্না করার জন্য। জল ফুটছে আর তার সঙ্গে সিদ্ধ হচ্ছে গমচূর্ণ। বিকালের দিকে হঠাৎ এক বুড়ো—তার লম্বা সাত হাত দাড়ি—এসে বনবিদারণের কাছে বল্‌লে, "আমায় একটু খেতে দাও না গো।"

বনবিদারণ ভাল মনে যেই একটু খাবার তুলতে নীচু হয়েছে, অমনি বুড়োটা তিড়িং করে এক লাফে তার ঘাড়ে উঠে এমন এক গুঁতো মারল যে বনবিদারণ একেবারে চিৎপটাং হয়ে অজ্ঞান। বুড়োটা এক চুমুকে সব খাবার খেয়ে উধাও হয়ে গেল।

লাচাউসিস আর পাহাড়পাতন ফিরে এসে দেখে, ওমা! এক ফোঁটাও খাবার পড়ে নেই। বনবিদারণ লজ্জায় একেবারে চুপ।

লাচাউসিস্ বল্‌লে, "এঃ, বনবিদারণ! তুমি রান্নার কিছুই জান না দেখছি। কাল পাহাড়পাতন বাড়ি থাকবে।"

পরের দিন পাহাড়পাতনের পাহারার দিন। তারও ঐ একই দশা হল। তিনবন্ধুর সেদিনও খাবার জুটল না।

লাচাউসিস হাত নেড়ে বল্‌ল, "কাল আমি বাড়ি থাক্‌ব, তোমরা যাবে শিকার করতে।"

সেদিন লাচাউসিস রান্না করছে। টগবগ করে জল ফুটছে, সমস্ত বন জুড়ে সুন্দর গন্ধ ছড়াচ্ছে, এমন সময় বুড়োটা আবার হাজির হয়ে বলল, "এক চামচে খেতে দেবে।" লাচাউসিস তার দিকে তাকিয়ে থেকে বল্‌ল, "তোমার যত ইচ্ছা খাও।" এই বলে সে যেমন নীচু হয়েছে অমনি বুড়োটা তার কাঁধে লাফিয়ে উঠেছে। কিন্তু লাচাউসিস কি যে-সে? সে কষে বুড়োর দাড়িটা ধরেছে চেপে। তারপর সেই লম্বা দাড়ি ধরে টানতে টানতে বুড়োকে এনে তার দাড়িটা ওকগাছের সঙ্গে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেল্‌ল। এতদিনে বোঝা গেল কে খাবার খেয়ে যেত।

বুড়ো তো রেগে-মেগে বল্‌ল, "ওহে উল্লুকচন্দ্র, ভল্লুক-কর্ণ, আমার কর্তা তোমায় এর জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেবেন, তখন বুঝবে ঠেলা।"

—"দেখা যাক্‌," লাচাউসিস বল্‌ল।

সন্ধ্যাবেলা পাহাড়পাতন আর বনবিদারণ শিকার থেকে ফিরে দেখে খাবার তৈরি—তারা তো অবাক। লাচাউসিস হেসে বল্‌ল, "আশ্চর্য হয়ো না। সকালে তোমাদের আরও একটা অদ্ভুত জিনিস দেখাব—ওকগাছে একটা বদমাস্‌ বুড়োকে বেঁধে রেখেছি।"

কিন্তু পরের দিন লাচাউসিস বন্ধুদের মজা দেখবার জন্য নিয়ে গিয়ে দেখে—ওমা! বদমাস বুড়োটাও নেই, আর ওক গাছটাও নেই। পাজীটা ওকগাছ-শুদ্ধ মাটির তলায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, রয়েছে কেবল একটা গর্ত।

লাচাউসিস ভীষণ রেগে গিয়ে বল্‌ল, "মাটির তলা থেকে আমি খুঁজে ওকে বার করবই। শুধু তাই নয়, যে প্রভুর কথা ও রাত্রে বল্‌ছিল তাকেও পাকড়াও করব।"

বনবিদারণ উইলোগাছের ছাল পাকিয়ে একটা দড়ি তৈরি কর্‌ল আর পাইনগাছের শিকড় থেকে হল একটা ঝোড়া। ঝোড়াটা দড়ির সঙ্গে বাঁধা হল, লাচাউসিস ঝোড়াটায় বস্‌ল। তখন পাহাড়পাতন আর বনবিদারণ তাকে আস্তে আস্তে সেই গর্তটা দিয়ে নামিয়ে দিতে লাগল। নামতে নামতে লাচাউসিস একেবারে পাতালপুরীতে এসে উপস্থিত। ঝোড়া থেকে নেমে, হাত পা ছড়িয়ে নিয়ে কোমর বেঁধে সে এগিয়ে চল্‌ল কাঁধের উপর ডাণ্ডাটা ধরে। সামনেই তার একটা দুর্গ। দুর্গের মধ্যে ঘরের পর ঘর, প্রত্যেক ঘরটা আগের ঘর থেকে ভাল। বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই বেশ আরামেই আছে। সব থেকে শেষ ঘরে এসে লাচাউসিস অবাক হয়ে চেয়ে রইল। একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে সেই ঘরে বসে। মাথায় তার পা পর্যন্ত লম্বা ঘন সোনালী চুল, গায়ে বরফের মত সাদা পোশাক, মাথায় চক্‌চকে মুকুট, গায়ে ঝক্‌ঝকে গয়না আর পায়ে হরিণের চামড়ার জুতো। লাচাউসিস এমন সুন্দর, দামী পোশাক জীবনে দেখেনি। কিন্তু এততেও মেয়েটির মনে সুখ নেই নিশ্চয়ই। দেওয়ালের সঙ্গে মোটা শিকল দিয়ে সে বাঁধা রয়েছে, দুঃখে তার বড় বড় চোখ দুটো ম্লান হয়ে গেছে। লাচাউসিসকে দেখতে পেয়ে মেয়েটি চম্‌কে উঠে বল্‌ল, "আহা, ভল্লুক-কর্ণ! বেচারী! তুমি কোথায় এসেছ জান? এক্ষুনি ন'মাথা-ওলা দৈত্যটা তোমায় মেরে ফেল্‌বে। সেইতো এখানকার কর্তা।"

লাচাউসিস বললে, "হুঁ, কর্তাকে কখনও দেখিনি, আর তার সঙ্গে যুদ্ধও করিনি। তবে দেখা যাক চেষ্টা করে কে জেতে।"

লাচাউসিস মেয়েটিকে একে একে জিজ্ঞাসা করল কি তার পরিচয়, কি করে এখানে এসেছে আর কেনই বা এমন করে বাঁধা রয়েছে। মেয়েটি বল্‌ল কেমন করে ন'মুখো দৈত্যটা তাকে তার বাড়ি থেকে চুরি করে এনেছে আর সে তাকে বিয়ে করেনি বলে এমন করে বেঁধে রেখেছে।

লাচাউসিস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে মনে মনে ঠিক করল দৈত্যটাকে মারতেই হবে।

তখন সুন্দরী মেয়েটি লাচাউসিসকে দুটো ছোট ছোট পিপে দেখাল—একটাতে আছে ঝরণার জল আর অপরটায়—জীবনবারি। কেমন করে ও-দুটো খোলা যায় সেটাও সে লাচাউসিসকে দেখিয়ে দিল আর বল্‌ল যে জীবনবারি না খেলে দৈত্যটাকে মারাও যাবে না।

কাজে কাজেই একটা পিপে যেই লাচাউসিস খুলতে আরম্ভ করেছে অমনি ন'মুখো দৈত্যটা ঝড়ের বেগে এসে উপস্থিত। নাক ঝেড়ে হেঁড়ে গলায় গন্ধ শুঁকে সে বলল, "কে রে এখানে এসেছিস্?"

লাচাউসিসকে দেখ্‌তে পেয়েই দৈত্যটা তার দিকে এগিয়ে গেল। দুজনে লেগে গেল জোর মারামারি। দুজনেই সমান, কেউ কম যায় না। তাদের পায়ের চাপে মাটি যেন থেকে থেকে কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌ল ভীষণ শব্দ করে করে। লাচাউসিসের শরীর বেয়ে দর দর করে ঘাম বইতে লাগ্‌ল। আর থাম্‌তে থাম্‌তে দুজনেই খুব ক্লান্ত হয়ে উঠল। দৈত্যটা

একটা পিপে উঠিয়ে ঢক্‌চক্‌ করে জল খেতে লাগ্‌ল। লাচাউসিস অপর পিপেটা থেকে জল খেল। এদিকে হল কি দৈত্যটা খেল ঝরণার জল আর লাচাউসিস খেল জীবন-বারি। জল খাওয়া হলে নতুন উদ্যমে আবার যুদ্ধ শুরু হল। কিন্তু হঠাৎ লাচাউসিসের গায়ে যেন হাজার হাতীর বল হল। সে ডাণ্ডাটা দিয়ে এমন দমাদ্দম্‌ মারতে লাগ্‌ল যে কামারে যখন ডাণ্ডাটা তৈরী করেছিল তার থেকেও বেশী আগুনের ফুল্‌কি ছড়াতে লাগ্‌ল চারিদিকে। অবশেষে দৈত্যটা মরে পড়ে গেল। যুদ্ধও শেষ হল।

শিকল ভেঙ্গে লাচাউসিস মেয়েটিকে মুক্তি দিয়ে তাকে বাইরে নিয়ে গেল। ঝোড়ার কাছে এসে মেয়েটি তার উপর বস্‌ল। লাচাউসিস দড়িতে টান দিয়ে বল্‌ল, "ওহে, বনবিদারণ, ও পাহাড়পাতন, তোল আমাদের।"

ওরা মেয়েটিকে টেনে তুল্‌ল বটে কিন্তু লাচাউসিস যখন উঠ্‌তে গেল তখন হঠাৎ দড়িটা পটাং করে গেল ছিঁড়ে। দড়াম্‌ করে লাচাউসিস পড়ে গেল। ভয় পেয়ে বনবিদারণ, পাহাড়পাতন আর মেয়েটি কান্না জুড়ে দিল।

কিন্তু লাচাউসিস ঘাবড়াবার ছেলে নয়। সে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। উপরে যাবার উপায় একটা খুঁজে পেতেই হবে, যতই বাধা থাক। হঠাৎ সে দেখতে পেল সেই বদমাস বুড়োটা এক কোণে দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। বুড়োটা লাচাউসিসকে দেখেই ঝড়ো পাতার মত কাঁপতে আরম্ভ করেছে। ও তো জানে লাচাউসিসের হাত থেকে তাকে বাঁচাবার মত কেউই আর নেই। ওক গাছের গুঁড়ি ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে, পালাতেও পারে না। লাচাউসিস বল্‌ল,

"যদি আমায় বাইরে যাবার পথ দেখিয়ে দাও, তবে ছেড়ে দেব। না হলে দেখাব মজা।"

ডাণ্ডা ঘাড়ে ফেলে লাচাউসিস বুড়োকে এক গুঁতো মারল। পথ দেখিয়ে বুড়ো লাচাউসিসকে ঠিক বাইরে নিয়ে এল। বনের যে জায়গায় লাচাউসিস ঘর করেছিল সেখানেই সে এসে উপস্থিত হয়েছে। বাড়ির দরজায় বসে বনবিদারণ, পাহাড়পাতন আর মেয়েটি খালি কাঁদছে লাচাউসিসের জন্য। লাচাউসিস পুরনো জায়গায় ওক গাছটা বসিয়ে দিয়ে বুড়োর দাড়ি টেনে বল্ল, "চলে যাও, আর এসো না কখনো।" সে তো ছাড়া পেয়ে একেবারে অদৃশ্য! লাচাউসিসকে দেখে ওর বন্ধুরা যে কত খুশী হল কি বল্ব। মেয়েটিকে সকলে মিলে তার বাড়ি নিয়ে গেল। খুবই আনন্দিত হল সবাই। লাচাউসিস, পাহাড়পাতন আর বনবিদারণ সেখানে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগ্‌ল। কয়েক বছর পরে তারা আবার নতুন কাজের আশায় বেরিয়ে পড়ল। এমন কত কাজই না আছে সকলের ভাল হয় যাতে।

তিন গাঁটওলা দড়ি

বাবা, মা আর এক ছেলে।

ছেলেটি ছোটবেলা থেকেই বড্ড জল ভালবাসে। বাড়ি থেকে বেরিয়েই সোজা চলে যায় পুকুরে। বাবা মায়ের আদেশ আর বাবার চড়চাপড় তাকে আটকাতে পারে না। জল যেন তাকে ডাকে। চামচ, কাঠের হামানদিস্তা, পেন্সিল—এই সবের জন্য মাকে ব্যতিব্যস্ত হতে হয়—সেগুলো প্রায়ই খোকনের নৌকা হয়ে পুকুরে ভাসে। আর একটু বড় হয়েই সে পুকুরে সাঁতার কেটে কেটে জল তোলপাড় করতে লাগ্‌ল।

বাপ-মা তাকে জলের কাছ থেকে সরাতে না পেরে ঠিক করলেন ওকে নাবিকই করা হোক। এক বুড়ো নাবিকের কাছে ছেলেকে সাক্‌রেদী করতে পাঠান হল। বুড়োও রাজী হল।

অনেক দিন কেটে গেল। একদিন বুড়ো নাবিক ছেলেটিকে তার বাপ-মার কাছে নিয়ে এসে বল্‌ল, "আমার যা কিছু জানা ছিল সব একে শিখিয়ে দিয়েছি। ভাল নাবিক হবে ও নিশ্চয়ই।"

চলে যাবার আগে বুড়ো তার ছাত্রকে তিন তিনটে গাঁটওলা একটি দড়ি উপহার দিয়ে বল্‌ল, "বাবা, এখন তো সমুদ্রে আর বাতাসের সব খবরই তুমি জান। কিন্তু শুধু জানলেই হবে না, তাদের চালাতে হবে। ধর, সমুদ্রে একদম হাওয়া নেই, সব চুপচাপ, নিথর তখন নাবিককে ধৈর্য হারালে চলবে না।

তাকে অপেক্ষা করতে হবে কখন পালে বাতাস লাগে। কিংবা খুব জোর তুফান উঠ্‌ল, সমুদ্র ফুলে ফেঁপে ভয়ঙ্কর হয়েছে, নাবিকের তখন চাই সাহস আর শক্তি যাতে জাহাজডুবি না হয়। তুমি বাছা, খুবই ভাল আর আমার অতি প্রিয়। এই তোমায় তিন গাঁটওলা দড়িটা দিলাম। যতক্ষণ এইটি তোমার কাছে থাকবে ঝড়ই উঠুক আর বাতাস নাই-ই থাক তোমার কোন অসুবিধাই হবে না। জল আর বাতাস তোমার হুকুম তামিল করবে। যদি বাতাস ওঠে একটা গাঁট খুলে দিও। অনুকূল হাওয়া বইবে। যদি জলদস্যুরা তোমায় তাড়া করে আর একটা গাঁট খুলবে, ঝড়ের চোটে তোমার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না কেউ। পাগলা সমুদ্রকে যদি ঠাণ্ডা করতে চাও তবে তৃতীয় গাঁটটা খুলে দেবে।"

এরপর একদিন জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ছেলেটি। সব জায়গায়ই সুন্দর বাতাস। নাবিকেরা তার নাম দিল পয়মন্ত কাপ্তেন।

একদিন আমাদের কাপ্তেন গিয়ে উপস্থিত এক রাজ্যের রাজধানীতে। বন্দরে লোকের ভীড়ে পথ দেখা যায় না। ব্যাপার কি? সবাই নাকি সমুদ্রে বেরোবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু হঠাৎ সমুদ্র একেবারে শান্ত, নিঃস্পন্দ হয়ে গেছে, একবিন্দু জলও যেন সরছে না, তীরে একটা গাছের পাতাও যেন নড়ছে না। বাধ্য হয়ে সব জাহাজ বন্দরে বন্দী। একদিন কেটে গেল, দুদিন কেটে গেল, তবু বাতাসের চিহ্ন পর্যন্ত নেই, সব জাহাজের কাপ্তেনরা বসে বসে শিস্ দেয় আর ভাবে, ভাবে আর শিস্ দেয়—কি আর করবে বল? মাঝে মাঝে রেগে মেগে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সমুদ্রকেই গালাগালি দেয় তারা।

আর এদিকে কাপ্তেনদের চেয়ে সে রাজ্যের রাজপুত্র আরও চটে আগুন। পাশের রাজ্যে তাঁকে যেতে হবে এখনই, নয়তো রাজকন্যার বিয়ে হয়ে যাবে অন্য কারো সঙ্গে। প্রথম দিন কেটে গেল। রাজপুত্র এক থলি মোহর পুরস্কার ঘোষণা করলেন—যে তাঁকে নিয়ে যেতে পারবে তার জন্য। দ্বিতীয় দিনও কাটল—রাজপুত্র ঘোষণা করলেন যে তাঁকে নিয়ে যেতে পারবে সে হবে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সেদিনও চলে গেল। এবারে রাজপুত্র বললেন তাঁর রাজ্যই তিনি দান করে দেবেন।

সব কাপ্তেনরাই মোহর, কিংবা রাজপুত্রের বন্ধুত্ব, কিম্বা রাজ্যটা পেলে খুশীই হত, কিন্তু হা কপাল, বাতাস যে আর বয় না। চতুর্থ দিনে রাজপুত্র একেবারে মরীয়া হয়ে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিলেন, সাজপোশাকও করলেন না।

আমাদের পয়মন্ত কাপ্তেনের রাজপুত্রের জন্যে দয়া হল। সে রাজী হল পাশের রাজ্যে তাঁকে নিয়ে যেতে। প্রথম গাঁটটা খুলে দিতেই দিব্যি বাতাস শুরু হল। নোঙর তুলে ঢেউ কেটে ছোট জাহাজটা এগিয়ে চল্‌ল।

খুব সময় মতই হয়েছিল যাওয়া। রাজকন্যার বাবা ঠিক করেছিলেন আর একদিনের মধ্যে রাজপুত্র না এলে অন্য এক রাজাকেই জামাই করবেন তিনি।

সকলেরই খুব আনন্দ হল। ধুমধাম চল্‌ল ছমাস ধরে। রাজপুত্রও সেই রাজ্যেরই রাজা হয়ে রাজকন্যাকে নিয়ে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন।

কাপ্তেন বেচারা তার জাহাজ নিয়ে সেই পুরনো বন্দরে ফিরে গেল। বুড়ো রাজার সঙ্গে দেখা হল। আর দেখা

হল এ রাজ্যের রাজকন্যার সঙ্গে। যেমন দেখা অমনি ভীষণ ভাল লেগে গেল তার। রাজকন্যা অপরূপ সুন্দরী, কাজেই ঘটকের আনাগোনার আর বিরাম নেই। কিন্তু সবাইকেই ফিরিয়ে দেন রাজকন্যা। বুড়ো বাবাকে একলা ফেলে যাবার ইচ্ছা নেই তাঁর। কিন্তু আমাদের কাপ্তেনকে রাজকন্যা আর ফেরাতে পারলেন না। একে একে সব ঘটকদের আর রাজা-রাজপুত্রদের দেশে ফিরে যেতে হল। কেবল এক দ্বীপের রাজা থাকতে চাইলো আরও কয়েকদিন, যদি অন্য কোন রানী পাওয়া যায়।

কিন্তু আসলে ঐ রাজাটা ভারী পাজী। তার একটা খারাপ মতলব ছিল। এক রাত্রে দলবল নিয়ে সে করল কি রাজকন্যাকে চুরি করে তার ছোট্ট জাহাজে করে পালাল তার দ্বীপে। এ কথা জেনে বুড়ো রাজা আর পয়মন্ত কাপ্তেন তো রেগে আগুন। কেবল বুড়ো রাজা যখন চোখের জল ফেলতে লাগলেন, তখন আমাদের কাপ্তেন জাহাজ নিয়ে তাড়া করে চল্‌ল পাজী রাজাকে।

কিন্তু সেই দ্বীপে পৌঁছনো সহজ নয়। চারপাশে ডুবো পাহাড় আর চোরা পাথর। কি করা যায় তবে? দ্বীপের একটু দূরে নোঙ্গর ফেলল কাপ্তেন বেচারা। এদিকে দ্বীপ থেকে রাজার সৈন্যরা সব জাহাজে চড়ে কামান আর বড় বড় সব হাতিয়ার নিয়ে মুখ কালো করে এগিয়ে আসতে লাগ্‌ল। কিন্তু কাপ্তেন ভায়া তো যে-সে নয়। কাজেই তাকে বোকা বানানো গেল না।

হঠাৎ সে দড়িটার দ্বিতীয় গাঁটটা খুলে দিল। আর যায় কোথায়! ভীষণ বেগে তুফান উঠ্‌ল। পাহাড়ের মত উঁচু

উঁচু ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগ্‌ল। পাল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, জাহাজের তক্তা খসে গেল আর নাবিকেরা হতাশ হয়ে আর্তনাদ করতে লাগ্‌ল। বদমাস রাজার ডাকাত সৈন্যগুলো ফিরতে পারলে বাঁচত, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ঝড় এত জোরে হচ্ছে যে পয়মন্ত কাপ্তেনের জাহাজখানাও কাঠের টুকরোর মত এদিক ওদিকে ছিটকে যাচ্ছে। কিন্তু তার হাত তো খুব ভাল; কাজেই কোন ক্ষতি হল না। কিছুক্ষণ পরে সে তৃতীয় গাঁটটা খুলে দিল।

ঝড় থেমে গেল। ওমা, শত্রুপক্ষের জাহাজগুলো গেল কোথায়? শান্ত সমুদ্রের বুকে কতকগুলো পিপে আর কাঠের টুক্‌রো ভাসছে এখানে সেখানে। মনের আনন্দে সকলে গিয়ে রাজকন্যাকে উদ্ধার করল।

রাজকন্যা আর কাপ্তেনের বিয়েতে খুব উৎসব হল, গান-বাজনা হল, খাওয়া দাওয়া হল, বাজি পুড়ল, রোশনাই জ্বল্‌ল। বুড়ো রাজা কাপ্তেনকে বললেন, "আমি তো বুড়ো হয়েছি বাবা, তুমি সিংহাসনে বসে রাজ্য শাসন কর।"

কাপ্তেন ভাবতে লাগ্‌ল, ভাবতেই লাগ্‌ল। কি করা যায়? অবশেষে সে বল্‌ল, "রাজত্ব নিয়ে আমি কি করব? আমার জাহাজই ভাল। রাজা আর রাজপুত্র তো অনেক দেখলুম। রাজ্যশাসন আমার কাজ নয়। রাজা হলে প্রজাদের উপর অত্যাচার করা আর পাশের রাজ্যের সঙ্গে ঝগড়া করা ছাড়া আর কি কাজ আছে?"

সুতরাং একদিন পয়মন্ত কাপ্তেনের জাহাজ আবার বন্দর ছাড়ল। তার রাজকন্যা-বৌও সঙ্গে চল্‌ল। পথে সব সময় সুন্দর বাতাস বইতে লাগ্‌ল।

অনেকদিন পরে রাজকন্যার এক ছেলে হল। কে জানে সেও হয়তো একজন কাপ্তেন হবে। সুখে স্বচ্ছন্দে সবাই রইল।

ওঃ! দড়িটার কি হল জিজ্ঞাসা করছ?

কাপ্তেনের ছেলে বাপের স্বভাবই পেয়েছিল। সব কিছু জলে ফেলার অভ্যাস। কিছু না কিছু রোজই জাহাজ থেকে হারাবেই হারাবে। কোনদিন একটা বাল্‌তি, কখনও একটা ঝাটা আবার কোনদিন বা অন্য কিছু। অমনি একদিন বাচ্ছা ছেলেটি তার বাবার তিন গাঁটওলা দড়িটা দেখতে পেয়ে সেটাকেও নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

দড়িটা পেলে কিন্তু বেশ হয়, না?

কয়লাওয়ালার গোয়েন্দাগিরি

এক কয়লাওয়ালা। বড়লোক বলা যায় না তাকে। আজ আছে তো খায়, কাল নেই তো খায় না, এমনই অবস্থা। কাঁচা কয়লা পুড়িয়ে সে সহরে যায় সেগুলো বিক্রী করতে।

শহরে হঠাৎ একদিন তার এক চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দুজনে গল্পগুজব করতে লাগ্‌ল। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একজন দুজন করে অনেক দামী দামী পোশাক পরা ভদ্রলোক তাদের নজরে এল—সকলেই বেশ হোমরা-চোমরা গোছের আর নিশ্চয় শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান। কয়লাওয়ালা তাদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "দেখেছ! ভগবান ওদের বুদ্ধি দিয়ে পাঠিয়েছেন আর ওরা সব বড় সাহেব বনে গেছে। এরকম হতে পারলে হত বেশ।"

অপর লোকটি হেসে বল্‌ল, "বেশ তো এ আর এমন কথা কি। ঐসব চালাক বড় সাহেবরা যা পরেছে তুমিও তাই পর। আর বুদ্ধির কথা যদি বল, তোমারও ঘাড়ে তো একটা মুণ্ড রয়েছে—কে বেশী চালাক তা অবশ্য বলা যাবে না।"

বন্ধুর ঠাট্টায় কিন্তু কয়লাওয়ালার মেজাজ ঠাণ্ডা হল না। ভাল পোশাক গায়ে চড়াবার জন্য সে সবকিছু করতে প্রস্তুত।

ভেবে ভেবে শেষে সে বেপরোয়া হয়ে একটা দামী পোশাকই কিনে ফেল্‌ল সব টাকা খরচ করে। বাড়িতে যখন সে এল তখন পকেটে কিছুই নেই। তার বৌ তাকে দেখে বল্‌ল, "এবার অনেক টাকা পেয়েছ মনে হচ্ছে।"

ভাল পোশাক পরে কয়লাওয়ালা বস্‌তেও ভয় পাচ্ছিল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে বল্‌ল "উহুঁ, টাকাতো আমি আনিনি। কিন্তু আমি এখন লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোক হয়েছি। আমাদের নতুন জীবন আজ থেকে শুরু।"

বৌ তো চটে আগুন। "বটে, বটে! দেখছি শহরে গিয়ে কি খেয়ে এসেছ তাই বুদ্ধি বেড়েছে এত, না?" বল্‌ল সে।

এদিকে হয়েছে কি সেই অঞ্চলের এক ব্যারনের দামী একটি আংটি গেছে হারিয়ে। ব্যারন তো রেগেই অস্থির। তাঁর সেপাই যত জ্ঞানী লোক, যত যাদুকর সকলকে তলব করে এনেছে। হুম্‌কি দিয়ে ব্যারন বললেন, "আমার আংটি খুঁজে বার করতে হবে, নাহলে...। ঐ "নাহলে" মানে যে কি সেকথা আর বলে কাজ নেই। সে সব কালে নিজের নিজের এলাকায় এক একজন ব্যারন যেন রাজা কি দেবতা! সুতরাং যারা সব জড় হয়েছিল সকলেই বলির পাঁঠার মত ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতেই লাগল, কাঁপতেই লাগল—আংটিটা বার করতেই হবে।

কয়লাওয়ালাও আংটি হারানোর কথা শুনেছিল। সেও ব্যারনের প্রাসাদে গেল। ভয় আর কি? অমন করে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণও ভাল। সটান্ সে গিয়ে উপস্থিত ব্যারনের কাছে।

ব্যারন জিজ্ঞাসা করলেন, "কে হে তুমি?"

কয়লাওয়ালা বল্‌ল, "আমি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি, গুণী ব্যক্তি এবং তার উপর জ্যোতিষীও।"

—"বটে, এতই যদি তবে বল আমার আংটি কে নিয়েছে।"

যত যাদুকর, শিক্ষিত পণ্ডিতরা জমা হয়েছিল কয়লাওয়ালা তাদের দিকে তাকালো। সকলেই বোবা হয়ে বসে বসে ভাবছে কি করে বাঁচা যায়।

অবশেষে সে বল্‌ল, "সে সব হবে। তবে আমি একলা কাজ করি এবং করতে ভালবাসি। সত্যি যা তা চিরকালই সত্যি। কয়লা পোড়াতে গেলে একজনই যথেষ্ট, কেমন কি না? তার কারণ সকল কয়লাওয়ালারই নিজের নিজের গোপন পদ্ধতি আছে।"

অন্য লোকগুলোর জন্য দুঃখ হলেও কয়লাওয়ালা তাদের সবাইকে চলে যেতে বল্‌ল। ব্যারনও তাদের সেই আদেশ দিলেন।

তখন কয়লাওয়ালা গম্ভীরভাবে বল্‌ল, "সব মুস্কিলেরই আসান আছে। তবে চোর ধরতে হলে আমাকে সময় দিতে হবে আর বেশ দিস্তে দিস্তে কাগজ দিতে হবে।"

এমনিভাবে কয়লাওয়ালা প্রাসাদে বাস করতে আরম্ভ করল। খাওয়া, ঘুমানো আর লেখা—এই তার কাজ। সকলে ভাবল লোকটা কি জ্ঞানী, কি পণ্ডিত। এর মধ্যে কত পাতাই লিখে ফেল্‌ল—ভাবতেই কেমন লাগে। তাছাড়া লেখার মধ্যে এত ইকড়ি-মিকড়ি, আঁকচড়া কার সাধ্য পড়ে বোঝে।

দিন কাটতে লাগ্‌ল, কাগজের পাহাড় জমে উঠ্‌ল, কিন্তু আংটিও মিল্‌ল না, চোরের পাত্তাও পাওয়া গেল না। ব্যারন মশাই অপেক্ষা করতে লাগলেন এক দিন, দুদিন…অনেকদিন। শেষে তাঁর আর ধৈর্য রইল না।

কয়লাওয়ালাকে ডেকে তিনি বল্‌লেন, "তিন দিনের মধ্যে যদি চোরের সন্ধান না পাই তবে বুঝবে মজা।" কয়লাওয়ালা বল্‌ল, "ভাল জিনিস কি অত সহজে মেলে। জ্বালানী কাঠে আগুন না ধরলে কয়লা পোড়াই কি করে?"

কিন্তু ওসব কথা ব্যারন তো আর শুনবেন না।

কয়লাওয়ালা দেখ্‌ল এতদিন অপেক্ষা করেও বিশেষ সুবিধা হল না। কিন্তু কি আর করবে সে।

তিন তিনটে চাকর রাত্রিদিন তার সেবা করে। কয়লাওয়ালার মাথায় এটা ঢোকেনি যে ঐ তিনজনই আংটিটি চুরি করেছে। ওসব ভাববার কি ছাই সময় আছে। তিন দিন পরে ব্যারনের হাত থেকে যে সাজা পেতে হবে তাকে। মনের দুঃখে কয়লাওয়ালা তার ভাগ্যের কথা ভাবছে তো ভাবছেই—খাওয়া ভুলে এমন কি লেখাও ভুলে।

একদিন কেটে গেল। রাত হল। একটা চাকর তার বিছানা তৈরি করতে এসেছে এমন সময় কয়লাওয়ালা আপনার মনে বলে উঠ্‌ল, "একটা গেল। আর দুটো রয়েছে।"

চাকরটা ভাবল, এই রে, ওর কথাই বলছে বুঝি। জেনে ফেলেছে তাহলে। ভয়ে তো বেচারার মাথা ঘুরতে লাগল। কোন রকমে ছুট্টে তার বন্ধুদের কাছে গিয়ে সে বল্‌ল, "সর্বনাশ হয়েছে। আমাকে ধরে ফেলেছে।"

দ্বিতীয় রাত্রে দ্বিতীয় চাকরের পালা। সে বিছানা তৈরি করছে। কয়লাওয়ালা দেখল শোবার সময় হয়েছে। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে সে বল্‌ল, "আর একটাও গেল। বাকী রইল একটা……।"

চাকরটা দৌড়ল তার বন্ধুদের কাছে। "আমাকেও জেনে ফেলেছে ভাই। আমি আর ওর সামনে বার হচ্ছি না। কি সাঙ্ঘাতিক।".

তৃতীয় দিনে তৃতীয় চাকরটা এল বিছানা করতে। মাথা নীচু করে হাত এলিয়ে কয়লাওয়ালা ভাবছিল। বলে উঠল, "তিনটেই গেল। আর তো নেই। কাল কি যে হবে?"

এমন জোরে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌ল মনে হল তার হৃদয়ই যেন কে উপড়ে ফেলেছে।

ভয়ে আধমরা হয়ে চাকরটা তাঁর বন্ধুদের কাছে গেল। "আমিও ধরা পড়ে গেছি। কি করা যায়? চল্‌ আমরা দোষ স্বীকার করে ফেলি।"

কয়লাওয়ালার কাছে গিয়ে তারা সব-কিছুই বলে ফেল্‌ল। টাকার অভাবেই তারা আংটিটা চুরি করেছে। কয়লাওয়ালা ভাবতে লাগ্‌ল ব্যারন কি করবেন ওদের নিয়ে। শেষে সে ঐ আংটিটা আনতে বল্‌ল আর তার সঙ্গে এক গামলা ফেনও। ফেনের মধ্যে আংটিটা ফেলে দিয়ে সে চাকরগুলোকে বল্‌ল সবটা ব্যারনের সব থেকে মোটা ষাঁড়টাকে খাইয়ে দিতে।

যেমন বলা তেমনি কাজ।

সকাল হতেই ব্যারনমশাই গটমট করে ঘুঁষি পাকাতে পাকাতে কয়লাওয়ালার ঘরে গিয়ে উপস্থিত।—"কোথায় চোর?"

কয়লাওয়ালা জিজ্ঞাসা করল, "চোরকে নিয়ে আপনি কি করবেন?"

—"আমি তাকে কুচিকুচি করে কেটে ফেল্‌তে বল্‌ব। কিন্তু কোথায় সে?"

কয়লাওয়ালা ষাঁড়টাকে দেখিয়ে দিল। গোয়াল থেকে এনে সেটাকে তো কাটা হল। আংটিটা বেরল তার পেট থেকে। ব্যারন তো আহ্লাদে আটখানা হয়ে কয়লাওয়ালাকে তাঁর প্রাসাদেই থাকতে বল্‌লেন। কিন্তু কয়লাওয়ালা তো আর বোকা নয়। একটা ঘোড়া আর একশ মোহর আদায় করে সে সরে পড়ল। বাব্বাঃ! আবার ওখানে?

রূপো, সোনা আর হীরের ঘোড়া

এক বুড়োর ছিল তিন ছেলে। মরবার আগে বুড়ো ছেলেদের ডেকে বল্‌ল, "তোদের ছেড়ে যেতে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে। যাই হোক্‌ আমি মরলে আমার কবরের কাছে তোরা এক একজন প্রথম তিন রাত্রি আসিস বাবা।"

ছেলেরা রাজী হল। বুড়ো মারা গেলে তাকে তিন ছেলে মিলে কবর দিল।

রাত হয়ে এল। এক ছেলেকে তো কবরের ধারে যেতে হয়। বড় আর মেজ ছেলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। —যাবার ইচ্ছা নেই মোটেই। ছোট ভাই দূরে বসে ঘোড়ার সাজ মেরামত করছিল। বাড়ির সব কাজই ওকে করতে হয়। অবসর নেই একটুও। বড় দুভাই তাকে কেবলই একাজে সেকাজে খাটিয়ে মারত। মনটা খুবই সাদা ছিল তার। তাই মুখ বুজে সবই সইতে হত তাকে। বড় দুভাই ঐ জন্য মনে করত ছোটটা একটা বোকা হাঁদা। বড় ভাই তাকে বল্‌ল, "এই হাঁদা, শোন্‌ এদিকে। বাবার কবরে যা দেখি। আমার সময় নেই।"

ছোট ভাইকে যেতে হল। আর রাতে সময় কাটাবার জন্য সে একটা ছেঁড়া লাগাম নিয়ে গেল সারাতে হবে। লাগাম সারাতে সারাতে রাতও বেড়ে চলল, তবু কাজ শেষ হয় না। এমন সময় হঠাৎ সে শুনতে পেল তার বাবার গলার স্বর। "কে? আমার বড় খোকা এলি?"

—"না বাবা আমি……ছোটকু।"

—"হুঁ, বড় খোকা এল না যে ?"

—"সময় নেই বাবা।"

বাবা বল্‌ল "বেশ বেশ। তুই এসেছিস, খুব খুশী হয়েছি। এই তোকে একটা রূপোর বাঁশী দিলুম। কিছু দরকার হলে এটাতে ফুঁ দিবি আর অমনি একটা রূপোর ঘোড়া রূপোর সাজ পরে তোর জন্যে একটা রূপোর পোশাক নিয়ে এসে হাজির হবে। তুই চড়িস, যা ইচ্ছা তাই করিস।"

ছোট ছেলে দেখল একটা রূপোর বাঁশী ঘাসের মধ্যে চক্‌চক্ করছে। সেটা তুলে নিয়ে পকেটে পুরে ফেল্‌ল সে।

সকালে বাড়ি ফিরে সারানো লাগামটা সে একটা পেরেকে ঝুলিয়ে রাখল। ভাইয়েরা তাকে কিছু জিজ্ঞাসাই করল না। কেবল খড় কাটতে পাঠিয়ে দিল তাকে। ক্লান্ত কিনা সেসব তো তারা দেখে না, তারা চায় কাজ।

দ্বিতীয় রাতও এল। এবার মেজ ভাইয়ের পালা। বড় আর মেজ ভাই আবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল—কে আবার যায় ? ছোট ভাই—ছাই ফেলতে ভাঙ্গাকুলো—তখন একটা ঘোড়ার জিন মেরামত করছে। মেজ ভাই তাকে বল্‌ল, "এই হাঁদু যাও তো ভাই, বাবার কবরের কাছে। আমার আবার কাজ রয়েছে।"

ঘোড়ার জিনটা নিয়ে কবরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল ছোট ছেলে। কাজ করতে করতে রাত হয়ে গেল বেশ। আবার বাবার গলার স্বর শোনা গেল, "মেজ এলি নাকি ?"

—"না বাবা। আমি এসেছি।"

—"বটে, মেজ এল না কেন ?"

—"ওর সময় নেই বাবা।"

বাবা বল্‌ল, "তা ভাল। তুই আবার এলি।
তুই এই সোনার বাঁশীটা নিয়ে যা। এটাতে ফুঁ দিলেই একটা
সোনার ঘোড়া সোনার সাজ পরে সোনার পোশাক নিয়ে
আস্‌বে। কাজে লাগলে চড়িস।"

ছোট ছেলে আগের মতই একটা সোনার বাঁশী পেল।
সেটা সে পকেটে রেখে দিল। সকালে বাড়ি ফিরে সে জিনটা
একটা পেরেকে ঝুলিয়ে রাখল। ভায়েরা তাকে কিছু না
জিজ্ঞাসা করে তাকে খড়গুলো গোছাতে বল্‌ল।

তৃতীয় দিনও এল। ছোট ভাই আজ খড় আছড়াবার
পাটাতনটা সারাচ্ছিল। দুভাই একসঙ্গে বলে উঠল, "আরে
হাঁদা তুই এখানে বসে আছিস কেন রে? বাবার কবরে যাবি
না? আজ তো তোর পালা।"

ছোট ভাই আর কি করে? ঘোড়ার গলার সাজটাই
আজ করা যাক্। কাজেই ওটাকে নিয়ে সে কবরে গিয়ে
উপস্থিত হল।

কাজ করতে করতে কখন যে মাঝরাত পার হয়ে গেছে
ছোট ছেলে টেরও পায়নি। সেদিনও বাবার কথা শোনা
গেল।—"ছোটকু এসেছিস্?"

—"হ্যাঁ বাবা", ছোট ছেলে বল্‌লে।

—"আমি খুব খুশী হয়েছি। আজ তোকে এই হীরের
বাঁশীটা দিলুম। এইটে বাজালে আগের মত হীরের সাজ
পোশাকওলা একটা ঘোড়া আস্‌বে। দরকার হতে পারে।"

ঘাসের উপর থেকে হীরের বাঁশীটা কুড়িয়ে নিয়ে ছোট
ছেলে পকেটে পুরে ফেল্‌ল।

সারারাতে ঘোড়ার গলার সাজটা সারিয়ে নিয়ে সকাল-

বেলাই সে বাড়ি গেল। ভাইয়েরা আজ তাকে খড়গুলো নিয়ে আসতে বলল। সারাদিন ধরে সে কাজ করতে লাগল আর বাবার কথা ভাবতে লাগল।

এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেল রাজার লোক ঢেঁড়া পিটিয়ে থেমে থেমে বলতে বলতে যাচ্ছে, "রাজার আদেশ শোন, রাজার আদেশ শোন। যে কোন প্রজা কাঁচের পাহাড়ে উঠে রাজকুমারীর হাত থেকে হীরের আংটি নিতে পারবে, সেই হবে রাজার জামাই।"

রাজকন্যা দেখতে পরমাসুন্দরী, রাজার তো মোটে ঐ একটিই মেয়ে। অনেকেই বিয়ে করতে চায়, কিন্তু রাজকন্যার আর পছন্দ হয় না। অমন বুদ্ধিমান বিনয়ী, সৎ আর সাহসী লোকই বা কোথায়? ভাল মন্দ বোঝাই বা যাবে কি করে?

এমন সুন্দরী রাজকন্যা আর টাকাকড়ি পাবার জন্যে সকলেই খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে লাগল।

রাজা হুকুম দিলেন একটা মস্ত কাঁচের পাহাড় তৈরি করতে। চুড়োয় থাকবে একটা বাড়ি রাজকুমারীর জন্য। সূর্যের কড়া আলোয় গায়ের রঙ্ পুড়বে না তা হলে, বৃষ্টিতে অমন ঘন কালো চুলও ভিজবে না। রাজা ঘোষণা করলেন যে ঐ পাহাড়ে উঠে রাজকুমারীর হাত হতে হীরের আংটি নিতে পারবে সেই হবে রাজকুমারীর স্বামী। এই কাজ করতে চাই বুদ্ধি, সাহস আর শক্তি।

চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? কাজেই দেশ বিদেশ থেকে রাজপুত্র, বড় বড় যোদ্ধা, বড় বড় লোকের ছেলে আর অনেক রকম রকম বড় লোকের ছেলেরা এল—সকলেই রাজার জামাই হতে চায়। আর তাদের থেকেও অনেক

অনেক বেশী এল সাধারণ লোক—ভাগ্য পরীক্ষা করতে। আমাদের দুভাইও যাবার জন্য তৈরি হল। বাক্স থেকে সব চেয়ে ভাল পোশাক-টোশাক বার করল তারা। ছোট ভাই বল্‌ল, "বড়দা ও ভাই মেজদা, আমায় নিয়ে চল।"

বড় ভাই বল্‌ল, "তোমার আবার এ বুদ্ধি কেন? আমরা বুদ্ধিমান, সৎ রাজা আমাদের জামাই করতে লজ্জা পাবেন না। কিন্তু তুই তো একটা হাঁদা-গঙ্গারাম যা, যা। তার চেয়ে ব্যাঙের ছাতা কুড়োগে বনে গিয়ে। আর আমাদের জন্য রুটি সেঁকে রাখিস্, এসে খাওয়া যাবে।"

তাই হোক তবে। ছোট ভাই একটা ঝোলা নিয়ে বনে গেল। একটা ভাঙ্গা ডালে ঝোলাটা ঝুলিয়ে রূপোর বাঁশীটা বার করে সে দিল এক ফুঁ। ব্যাস্ অম্‌নি কোথা থেকে রূপালী ঘোড়া রূপোর সাজ পোশাক নিয়ে এসে উপস্থিত। ছোট ভাই সেই পোশাক পরতেই মনে হল এমন সুন্দর বুঝি আর কেউ নেই। ভাল্লুকের লোমের একটা টুপী কায়দা করে লাগিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সে চলল কাঁচের পাহাড়ের দিকে।

পাহাড়ের তলায় এক গাদা লোকের ভীড়, কিন্তু ঐ কাঁচের পাহাড়ের আধখানাই ওঠে কার সাধ্যি! পিছলে পড়বে না কাঁচে? অনেকে তো ইতিমধ্যেই আছাড় খেয়েছে, নাক ভেঙ্গেছে, লোক হাসিয়েছে। আমাদের ছোট ছেলেটি বন থেকে রূপোর সাজে ঝড়ের মত বেরিয়েই পাহাড়ে উঠ্‌তে শুরু করে দিল্। ঘোড়ার খুর থেকে চক্‌মক্ করে আগুনের ফুল্‌কি ঝর্‌তে লাগল। লোকেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠ্‌লে। রাজা চেঁচিয়ে উঠলেন, রাজকন্যার বুক দুরদুর করতে লাগ্‌ল, আর অন্য-সব রাজপুত্রদের মুখ চুন হয়ে গেল। কিন্তু ঘোড়াটা

আর পারল না। আধখানা উঠেই পাক দিয়ে পিছু ফিরল, তারপর বনের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

ছোট ভাই ঘোড়া থেকে নেমে রূপোর পোশাক-আশাক ছেড়ে ফেল্‌ল। বোঝাটা নিয়ে, ব্যাঙের ছাতা তুলে সে বাড়ি ফিরে এল। ভায়েরা তাকে দেখে হাসাহাসি করতে করতে রূপোর সাজপরা রাজপুত্রের গল্পটা বল্‌ল। আর একটু হলে রাজকন্যার বিয়ে হয় আর কি।

ছোট ভাই বল্‌ল, "আধখানা করলে তো আর পুরো মেলে না।"

দু ভাই বল্‌ল, "দুর গর্দভ, তোর তাতে কিরে? যা, ছাতাগুলো ধুগে যা।"

পরের দিন ভাইয়েরা আবার কাঁচের পাহাড়ের দিকে চল্‌ল, নিজেরা চড়তে নয়—আর সব কে কেমন করে দেখবার জন্য। ছোট ভাই আজও তাকে নিয়ে যাবার জন্য অনুনয় বিনয় করল। কিন্তু দাদারা ধম্‌কে তাকে বল্‌লে জাম কুড়িয়ে জেলী করতে।

কাজেই আজও ঝোলাটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেচারা বনে চল্‌ল। বনে পৌঁছে ঝোলাটা রেখে সে সোনার বাঁশীটায় ফুঁ দিল। আর একটা সোনার সাজে ঘোড়া এসে উপস্থিত। সোনার পোশাক পরে আজ তো ছোট ভাইকে আরও ভাল দেখাচ্ছে। ফারের টুপী মাথায় দিয়ে সে কাঁচের পাহাড়ের দিকে চল্‌ল।

নাক ভাঙ্গার দল যত বাড়ছে ততই কাঁচের পাহাড়ে ওঠার লোক কম হচ্ছে। এখনই আর আগের মত উৎসাহই নেই। সোনালী রোদের মত ছোট ভাই তো এসে উপস্থিত হল।

কাঁচের পাহাড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। লোকে দম বন্ধ করে দেখতে লাগ্‌ল। রাজপুত্রেরা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, রাজা থম্‌কে গেলেন আর রাজকন্যা হাত বাড়িয়ে দিলেন। সোনালী রাজপুত্র কি সুন্দর। কিন্তু এততেও হল না। ঘোড়াটা পিছু হটে আবার বনে ফিরে গেল। আর ছোট ভাইটিও পোশাক ছেড়ে ভাল ছেলেটির মত বাড়ি ফিরে গেল। আগের দিনের মত আজও বড় ভাইয়েরা গল্প করতে লাগ্‌ল সোনালী রাজ-পুত্রের। ছোট ভাই থেকে থেকে বল্‌ল, "আধখানা করলে কি হবে ?" ভাইয়েরা তো তাকে বকুনি দিয়ে জেলী তৈরি করতে পাঠাল।

তৃতীয় দিনেও দু ভাই কাঁচের পাহাড়ের কাছে চল্‌ল। শেষ পর্যন্ত কে রাজকন্যার আংটি পায় দেখবার জন্য তাদের ভীষণ কৌতূহল হয়েছে। ছোট ভাই আজও তাদের সঙ্গে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ভায়েরা বনে গিয়ে তাকে শুক্‌নো কাঠ কুড়োতে বল্‌ল। ঐ ভীড়ে ওরা যাচ্ছে, যা গরম— ফিরে এসে ঐ কাঠজ্বালা আগুনে গরম জলে তারা গা ধোবে।

সুতরাং ছোট ভাই দড়ি নিয়ে বনে গেল। গিয়েই হীরের বাঁশীতে দিল ফুঁ। আর হীরের পোশাক নিয়ে হীরের সাজপরা ঘোড়া এসে হাজির। আজ ছোটভাইকে কি চমৎকার মানাল। চোখের উপর টুপিটা কায়দা করে নামিয়ে দিয়েই সে কাঁচের পাহাড়ের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

পাহাড়ের তলায় আজ প্রতিযোগীর সংখ্যা আরও কম— ঘাড় ভাঙ্গায় তো বীরত্ব কিছু নেই। ছোট ছেলে বিদ্যুতের মত বন থেকে বেরিয়ে এসেই পাহাড়ে উঠ্‌তে শুরু করে দিল। লোকেরা হৈ হৈ করে উঠ্‌ল, রাজকুমারী তো ভয়েই আধমরা,

অন্য প্রতিযোগীরা হাঁ হয়ে গেল, আর রাজা তো কি কি যৌতুক দিতে হবে তারই হিসাব করতে বসে গেলেন।

ছোট ছেলে রাজকন্যার হাত থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে তাকে অভিবাদন জানিয়েই পিছু ফিরল—একেবারে বিদ্যুতের বেগে বনে ঢুকে গেল। ঘোড়া থেকে নেমে, পোশাক ছেড়ে আংটিটা আঙ্গুলের উপর একটা ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে কাঠের বোঝা চাপিয়ে সে বাড়ি ফিরে গেল।

ভাইয়েরা খুব জোর গলায় কথাবার্তা বলছিল। তারা নিজেরা রাজকন্যার আংটিটা পায়নি বলে মনের দুঃখে আরও জোর চেঁচামেচি করছিল।

ছোট ভাই বল্‌ল, "কি করা যাবে, আংটিটা খুলে নেওয়াই হল।"

এরা রেগে-মেগে বল্‌ল, "যা যা, বুদ্ধু কোথাকার, এসবের তুই কি বুঝিস্‌। ভাল করে জল গরম করগে যা।"

রাজা এদিকে তাঁর জামাইয়ের জন্য অপেক্ষা করেই আছেন, করেই আছেন। কিন্তু কেউই আর আসে না। রাজা তো শেষে চটেই আগুন। তিনি হুকুম দিলেন যার হাতেই আংটি থাকবে সেই রাজসভায় আস্‌বে। অনেক লোক এল দলে দলে, কিন্তু আসল আংটিটা কারও হাতেই নেই। আমাদের বড় দুভাইও এল। রাজকুমারী সকলের মুখ দেখতে লাগলেন, আশঙ্কায় তাঁর বুক ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করতে লাগল—কিন্তু সেই আংটিটা কোথায়, কে নিল আংটিটা? এমন সময় রাজকন্যা দেখলেন দূরে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে তার আঙ্গুলে একটা পটি জড়ানো। তিনি তাকে ডেকে পটিটা খুল্‌তে বল্‌লেন। ওমা! ঐ তো তাঁর আংটিটা জ্বলজ্বল করছে। তবে কি…?

বড় দু ভাই অমনি চেঁচিয়ে উঠল তাদের ছোটভাই একটা গাধা, একদম বুদ্ধু,—ও নিশ্চয়ই আংটিটা চুরি করেছে। কিন্তু রাজকন্যা ওর দিকে তাকিয়েই বুঝলেন—এই তো সে। রাজা কিন্তু ঘাবড়ে গেলেন। কার কথা বিশ্বাস করেন তিনি। এত জোরে তিনি মাথা নাড়তে লাগলেন যে কাঁধ থেকে মাথা খসে পড়ে যেন।

তখন ছোট ছেলে তার বাঁশীগুলো বার করল। প্রথমটায় ফুঁ দিতেই রূপোর ঘোড়া এসে উপস্থিত। দ্বিতীয়টা বাজাতেই সোনার ঘোড়া হাজির হল, আর তৃতীয়টাতে এল হীরের ঘোড়া।

বড় ভাইয়েরা গলা ছেড়ে চেঁচাল, "চোর, চোর, চোর! ঘোড়াগুলো চুরি করেছে।"

অন্য লোকেরাও চেঁচামেচি করে উঠল। রাজাও ভাবলেন সত্যিই তো ঘোড়াগুলো কার?

ছোট ছেলে একে একে সব কথা খুলে বলল। তার বাপের কাছ থেকে সে কেমন করে ঘোড়াগুলো পেয়েছে। ভাইয়েরা তো শুনে জিভ্ কাটতে লাগল—তারা কি বোকা! রাজা তখনও ভাবছেন, রাজকন্যা দেখছেন ছোট ছেলেকে। আর লোকেরা চেঁচাচ্ছে, "বেশ, বেশ, রাজকন্যার খুব ভাল লোকের সঙ্গেই বিয়ে হচ্ছে।"

সকলেই বলতে লাগল, "ঠিক বটে, ঠিকই তো!"

আমি জেলি খেয়েছি

এক মা আর তার ছোট্ট ছেলে। কোথাও থেকে ছেলে ফিরে এলেই মা জিজ্ঞেস করে, "কি খেলি ওখানে ?" ছেলে তখন সব বলে কি খেল।

একদিন ছেলে দূরের গ্রামে জেলি খেয়ে এসেছে। এর আগে সে কখনও জেলি তো খায়ই নি এমন কি জেলির নামও শোনে নি। কাজেই বাড়ি গিয়ে যাতে না ভুলে যায় এইজন্য সে "আমি জেলি খেয়েছি, আমি জেলি খেয়েছি", এই বিড়বিড় করতে করতে চলতে লাগল।

পথে একটা পাঁকে ভরা খাদ পড়ে। ছেলেটা এক লাফে খাদ পার হয়ে গিয়ে কিন্তু ঐ 'জেলি' কথাটা ভুলে গেল একেবারে। কি আর করে ? বেচারা খাদের ধারে দাঁড়িয়ে জেলির মত দেখতে কাদার দিকে তাকিয়ে রইল—কথাটা আর মনেই আসে না।

এক জমিদার সেই সময় পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ছেলেটাকে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে কি করছিস রে ?"

"যেই আমি লাফালুম আর অমনি হারিয়ে গেল।"

"এঁ্যা ? হারিয়ে গেল ? তাহলে খুঁজে বার করতেই হবে।" মনে মনে জমিদার ভাবলেন নিশ্চয়ই কিছু দামী জিনিস হারিয়েছে। তারপর তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "যদি আমি পাই কিন্তু তবে আমার।"

জমিদার মশাই নেমে পড়ে খাদে ঢুকে চারিদিকে কাদা ছিটিয়ে ছিটিয়ে খুঁজতে লাগলেন।

গ্রামের দারোগা আবার ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন ওই সময়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি খুঁজছেন জমিদার মশাই ?"

"ঐ যে হারিয়েছি আমরা !" জমিদার উত্তর দিয়ে আরও গভীর কাদার মধ্যে ঢুকলেন। দারোগাও ওর দিকে চেয়ে থেকে থেকে শেষে জামার হাতা গুটিয়ে পাঁকের মধ্যে ঢুকলেন।

খুঁজছে তো খুঁজছেই, খোঁজার আর শেষ নেই। একজন পাদ্রী ওদের দেখে এগিয়ে এসে বললেন, "কি খুঁজছ, বাছারা ?"

—আমরা কিছু হারিয়েছি, বললেন জমিদার।

—"দামী জিনিস। আপনি আসুন না।" পাদ্রী কি আর জমিদারের পিছনে পড়ে থাকতে পারেন। তিনি নিজে তো খাদে নামলেনই, তাঁর কোচোয়ানকেও ডাকলেন।

কোচোয়ান কাছে এসে খাদের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, "এঃ, কাদাটা যে একেবারে জেলির মত করে ফেলেছেন আপনারা।"

যেই না 'জেলি' কথাটা শোনা অমনি ছেলেটি এক লাফে খাদ থেকে উঠেই দৌড় লাগাল বাড়ির দিকে চেঁচাতে চেঁচাতে, "আমি জেলি খেয়েছি, আমি জেলি খেয়েছি।"

ওদিকে জমিদার, দারোগা আর পাদ্রী কি করলেন ? তারা ঐ কাদার মধ্যেই বসে রইলেন।

আমরা তো আর ওঁদের গায়ের কাদা পরিষ্কার করতে যাচ্ছি না।

তিন বিঘতে

বাপ আর ছেলে। ছেলেকে দেখতে ছোট্টটি—বড়ও হয় না, যেমন কে সেই। লম্বায় সে তিন বিঘত। বাবা ডাকে 'তিন-বিঘতে' বলে। কিন্তু বাঁটকুল হলে হবে কি, তিন-বিঘতের সাহস ভীষণ। আর সাহস না হলে ঐটুকু ছেলের আর আছেই বা কি?

একদিন তিন-বিঘতের ইচ্ছা হল দেশভ্রমণে যাবে। বাবা তো অনেক বোঝাল, কিন্তু তিন-বিঘতে কোন কথা না শুনে বেরিয়ে পড়ল একদিন।

যেতে যেতে সে এসে পড়ল একটা বনের মধ্যে। আর তো পারা যায় না—একে কত দূর রাস্তা, তায় আবার পাগুলো ক্ষুদে ক্ষুদে। কাজেই তিন-বিঘতে সটান শুয়ে পড়ল—এমন সুন্দর জায়গায় একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক্। যেমন শোওয়া, অমনি ঘুম।

কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে কি ঘুমোবার জো আছে। সে দেশের রাজা দলবল নিয়ে এসেছেন শিকার করতে। আর একটু হলেই রাজা তিন-বিঘতের পা-টা মাড়িয়ে দিয়েছিলেন আর কি। চমকে রাজা দেখেন একটা ক্ষুদে ছেলে। রাজা চেঁচালেন, "এই, আরে ক্ষুদে! ওঠ, ওঠ! রাস্তায় শুয়েছিস্ কেন? শেষে যে খরগোসে গুঁতিয়ে দেবে।"

কে কার কথা শোনে! তিন-বিঘতে নাক ডাকাতেই লাগল।

রাজা তো চটে আগুন। বললেন তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গদের বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করতে।

শব্দ শুনে তিন-বিঘতে তার পায়ের বুড়ো আঙুলটা একটু নাড়াল—কিন্তু ঘুমোতেই লাগল। রাজা বনতাড়ুয়াদের বললেন, "শব্দ কর জোরসে।" কিন্তু এবারও তিন-বিঘতে পা-টা একটু সরাল। রাজা তো একেবারে খাপ্পা, গ্রাহ্যই নেই একেবারে। "আবার শব্দ কর", বললেন তিনি।

এবারে তিন-বিঘতে রেগে-মেগে উঠে পড়ে বলল, "আমাকে বিরক্ত করছেন কেন? এমন ধাক্কা দেব উল্টে পড়বেন একেবারে।"

রাজা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে, তারপর হেসে গড়িয়ে পড়লেন—ভেঙ্গে না যান। বললেন, "বটে, ক্ষুদে, কোন্ ফড়িংকে ঘুসি দেখাচ্ছিস রে?"

তিন-বিঘতে ভয় না পেয়ে বলে উঠল, "ফড়িংয়ের কথা বলবেন না মশায়, বরঞ্চ ভাল্লুকের কথা বলুন। যদি বিশ্বাস না হয়, একটা ভাল্লুক জোগাড় করুন। তখন বুঝবেন ঠেলা আর আমাকে জামাই করতে চাইবেন।"

রাজা তো হেসেই অস্থির। তবু মজা দেখার জন্য বললেন, "বেশ, আমি রাজী। যদি তুই একটা ভাল্লুককে হারাতে পারিস, আমার জামাই করব তোকে। না হলে কিন্তু পিঠের চামড়া তুলে নেব।"

রাজার লোকেরা চারদিকে ছুটে একটা ভাল্লুকের গুহায় ভাল্লুক দেখতে পেল। ফিরে এসে তারা রাজাকে বল্‌ল, "মহারাজ, ভাল্লুক মিলেছে।"

রাজা তিন-বিঘতেকে যেতে হুকুম করলেন। সে বেচারা পকেট ভর্তি নুড়ি নিয়ে গুহার দিকে চল্‌ল।

ভাল্লুকের দিকে একটা পাথর ছুঁড়তেই তার ঘুম গেল

ভেঙ্গে। দ্বিতীয় পাথরেই ভাল্লুকটা গর্জন করে উঠল। তৃতীয় পাথরটা গায়ে লাগতেই ভাল্লুকটা তিন-বিঘতেকে তাড়া করল। তিন-বিঘতে চোঁচা দৌড় লাগাল, ভাল্লুকটা আসছে পেছন পেছন। তিন-বিঘতে দেখতে পেল সামনে একটা ধানের গোলা রয়েছে। সে একলাফে চৌকাট ডিঙ্গিয়ে গোলার মধ্যে পড়ে গেল। ভাল্লুকটাও জোর লাফ দিয়ে তার উপর দিয়ে গিয়ে গোলার মধ্যে পড়ল। তিন-বিঘতে বুদ্ধি করে আবার এক লাফে গোলার বাইরে এসেই দরজাটা দিল বন্ধ করে। ভাল্লুকটা হয়ে গেল বন্দী, যতই চেঁচাক না কেন।

তিন-বিঘতে বুক ফুলিয়ে রাজার কাছে গিয়ে বল্‌ল, "কি রাজা-মশাই, খুব তো ঠাট্টা করেছিলেন? ভাল্লুক চান তো গিয়ে দেখুন। অমন ভাল্লুক আমি জ্যান্ত ধরি। আপনার মেয়েকে একটা ফুলের মালা দিন গে যান।"

—"কেমন করে ধরলে হে", রাজা বললেন—হাসি বন্ধ হয়ে গেছে তাঁর।

তিন-বিঘতে বল্‌ল, "হুঁঃ! ধরব না কেন? মারিও নি, কিছুই নয়, কেবল কানটি ধরে গোলায় ফেলে দিয়েছি। দেখি, আপনার কোন সেপাই ওটাকে গোলা থেকে তাড়িয়ে দিক্, ধরা তো দূরের কথা।"

ভাল্লুকের ডাক শুনে সবাই তো কেঁপেই অস্থির, তাড়াবে আর কি—তিন-বিঘতের আড়ালে লুকোতে পারলেই বাঁচে। রাজার মেয়ের তো এখন বিয়ে দিতে হয়। রাজা ভাবতে লাগলেন। কথা দিয়েছেন তিনি। শেষে বললেন, "বেশ, বেশ, ক্ষুদে। একবার তোমার সাহস দেখলুম। এখন যদি তুমি বনে গিয়ে ন'জন ডাকাতকে ধরতে পার, তাহলে তোমায়

আমার জামাই করতে পারি।” মনে মনে ভাবেন রাজা—এবার আর ওর রক্ষা নেই। আমার প্রহরী যাদের ধরতে হিম্‌সিম্ খেয়ে গেল, তাদের ও আর কি করবে।

তিন-বিঘতে কিন্তু নাক উঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল ডাকাতরা থাকে কোথায়। তারপর কয়েকটা নুড়ি পকেটে নিয়ে চল্‌ল—বুদ্ধি থাকলে ওগুলোই কত কাজ দেয়।

বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় ছোট্ট এক বাড়িতে ডাকাতেরা থাকে। তিন-বিঘতে উপস্থিত হল সেখানে। তখন কেউই নেই, সে একটা গাছে চড়ে অপেক্ষা করতে লাগ্‌ল। মাঝরাতে ডাকাতগুলো ফির্‌ল। গাছের তলায় আগুন জ্বালিয়ে তারা খাওয়া-দাওয়া, হাসি-ঠাট্টা আর পরস্পরের প্রশংসা করতে লাগ্‌ল। তিন-বিঘতে তো গাছের উপর পাতার আড়ালে ছিল, ভয় পেয়েছিল কি না কে জানে! কিন্তু সে পাথরগুলো টুপটুপ করে ফেলতে লাগ্‌ল—একটা পড়ল একেবারে ডাকাত-সর্দারের মাথায়। সে তো ভুরু কুঁচকে তার সঙ্গীদের বল্‌ল, “আঃ, ঠিক করে খাও না। হাড় ছুঁড়ছ কেন?”

তিন-বিঘতে আর একটা নুড়ি ছুঁড়ল ঠিক সর্দারের কপাল তাগ করে। সর্দার গেল চটে। বল্‌ল,—“এই, খবরদার! হাড় ছোঁড়া বন্ধ কর, বদমাসের দল। মাথায় লাগছে, ভাল হবে না বলছি।” কিন্তু আবার একটা নুড়ি পড়ল তার কপালে। আর যায় কোথায়? সর্দার ঝাঁপিয়ে পড়ল তার দলের লোকদের উপর, মারতে লাগ্‌ল কিল-চড়-ঘুঁষি। তারাই বা ছেড়ে কথা কইবে কেন? দুপক্ষেই মারামারি চলতে লাগ্‌ল।

নিজেদের মধ্যে ঘুষোঘুষি করতে করতে শেষে সকলেই আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ল একে একে। তিন-বিঘতে দেখ্‌ল ওদের হাত পা নাড়ারও ক্ষমতা নেই আর। সে তখনি গাছ থেকে নেমে দড়ি দিয়ে প্রত্যেকের হাত পা বেশ করে বেঁধে রাজার কাছে গিয়ে বল্‌ল, "ও রাজা মশায়! আর হাসবেন? ডাকাত চেয়েছিলেন—দেখুন গিয়ে।"

রাজা চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু ক্ষুদে, ডাকাতগুলোকে কাবু করলে কি করে?"

—"কেন? ওদের কপাল ঠোকাঠুকি করে দিলুম। খুব তো সোজা। দেখুন না চেষ্টা করে।"

ডাকাতগুলোকে নিয়ে আসা হল। তাদের দশাসই চেহারা দেখে রাজাই ক্ষুদের পেছনে লুকোন আর কি!

তিন-বিঘতে বল্‌ল, "কই, আপনার মেয়েকে আনুন।" রাজার হাসি বন্ধ—কথা রাখতে তো হবে। তিনি বললেন, "যদি তুমি এতই বীর, তবে আমার রাজ্য থেকে আমার শত্রুসৈন্যদের তাড়াও দেখি। আমার রাজ্যের প্রায় আধখানা দখল করে ফেলেছে ওরা। ওদের হারাতে পারলে তখন বিয়ের কথাবার্তা হবে।

তিন-বিঘতে রাজার কাছ থেকে একটা সাদা আলখাল্লা আর একটা সাদা ঘোড়া চাইল। ঘোড়ায় চেপে, তরোয়াল উঁচিয়ে সে টগ্‌বগ্‌ করে একলাই একেবারে শত্রুসৈন্যদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হল। তরোয়াল ঘুরিয়ে সে বল্‌ল, "কে লড়াই করবি, আয়! একবার তরোয়ালের কোপ মারলে আমি একশ মাথা কাটি, দুবারে কাটি দুশ।"

শত্রুরা তো ঐ কথা শুনল, দেখ্‌ল একটা ক্ষুদে লোক

বসে আছে ঘোড়ার পিঠে। ওরা তো ভয় পেয়ে গেল—না জানি কি ভীষণ বীর—নাহলে একলা এতগুলো সৈন্যের সামনে আসে।

তারা ভাবল এ নিশ্চয়ই শয়তানের চেলা। মানে মানে পালানই ভাল। কাজেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগ্‌ল আর হুড়োহুড়িতে নিজেরাই নিজেদের অর্ধেক সৈন্য মাড়িয়ে ফেল্‌ল।

তিন-বিঘতে রাজার কাছে গিয়ে বল্‌ল, "খুব তো ঠাট্টা করেন! দেখুন গিয়ে কেমন আপনার শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছি। যান, যান আপনার মেয়েকে নিয়ে আসুন।"

রাজা আর কি করেন। তিনি রাজকন্যার কাছে দূত পাঠালেন—বিয়ের জন্য তৈরি হতে হবে তো।

কিন্তু তিন-বিঘতে বল্‌ল, "রাজামশাই, ব্যস্ত হবেন না। আমি বিয়ে করতে চাই না। বিয়ে করার সময়ই বা কোথায়? আমি দেশে দেশে ঘুরব, অনেক লোক দেখব আর আমার শক্তি আর বুদ্ধিও দেখাব তাদের।"

এই বলে সে চলে গেল।

আর কিন্তু সে ফেরে নি। তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি তো তার?

ভাগ্যবুড়ির ঝাঁপি

এক বুড়ি তার মেয়ে আর এক সৎমেয়েকে নিয়ে বাস করে। যেমন হয়—সৎমেয়েটি খুব পরিশ্রমী, হাসিখুশী আর বাধ্য, নিজের বলতে কিছুই নেই তার। আর তার বোন যেমন হিংসুটে, তেমনি স্বার্থপর আর তেমনি কুঁড়ে—কিন্তু মায়ের আদুরে। এদের বেলায়ও তাই।

ভোর থেকে রাত অবধি সৎমেয়েটি বাড়ির কাজ করে। আর তার বোন পায়ের উপর পা তুলে তার বিয়েতে কি কি গয়না দেওয়া হবে তাই দেখে। এ খায় এক টুক্‌রো শুকনো রুটি, আর ও খায় মধু দেওয়া মিষ্টি কেক্‌! সকাল থেকেই সৎমেয়ে শোনে, "এই মুখপুড়ী! এখানে আয়। এই কাজটা কর। ওটা রেখে দে। এটা নিয়ে আয়।" বুড়ি তো যন্ত্রণা দেয়ই, আবার তার মেয়ে এক কাঠি উপরে।

একদিন শীতকালে বুড়ি বললে, "আমার বেরী খেতে ইচ্ছে করছে। যেতেই হবে।"

এই না বলে খুদকুঁড়ো দিয়ে তৈরি একটা রুটি সৎমেয়ের হাতে গুঁজে দিয়ে একটা ঝোলা দিয়ে সে বেচারাকে বাড়ি থেকে পথে বের করে দিল। বল্‌ল, "এই ছুঁচো যা, বেরী নিয়ে আয় ঝোলা ভর্তি। না হলে বাড়ি ফিরলে দেখবি মজা।"

বেচারা আর কি করে? যেতেই হবে। কিন্তু কোথায় যাবে? চারিদিকে বরফ—বরফে বরফে সাদা হয়ে গেছে পথঘাট। রাস্তা থেকে বনে ঢুকতেই কোমর পর্যন্ত বরফে ঢুকে গেল সে। ভয় হলেই বা কি করা যায়, যেতে যে

হবেই। খালি হাতে বাড়ি ফেরা—ও বাবা! তার চেয়ে বরফে জমে মরা ঢের ভাল।

শীতের দিন ছোট। সন্ধ্যা হয়ে এল। ছোট্ট মেয়েটি বেরী পাবে কি? পথই খুঁজে পায় না। মনের দুঃখে একটা গাছের গুঁড়িতে বসে বসে সে কাঁদতে লাগ্‌ল। তার নিজের মায়ের কথা ভাবছে আর কাঁদছে, কাঁদছে আর চোখের জল মুচ্‌ছে—হঠাৎ সে আগুন দেখতে পেল। সেইদিকে যেতে দেখল একটা ছোট্ট পাথর-ছাওয়া ঘর—চিমনী দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আস্‌ছে।

"যাক্‌ বাবা। একটু গা গরম করা যাবে তবু," এই ভেবে সে ঘরটায় ঢুকতে গিয়েই দেখে এক বুড়ি। বুড়ি জিজ্ঞাসা করল, "কে বাছা তুমি? এত দেরী করে বনে এসেছ কেন গা?"

মেয়েটি তো সব কথা খুলে বল্‌ল। বুড়ি তাকে আদর করে উনুনের ধারে বসাল। একটু জিরিয়ে ঝোলা থেকে সে সেই বিচ্ছিরি রুটিটা বার করে আধখানা বুড়িকে খেতে দিল আর নিজে আধখানা খেতে লাগ্‌ল। বুড়ি একটু কামড়েই দেখে রুটিটা শক্ত, চিমড়ে আর তেঁতো। বুড়ি তখন নিজে একটা রুটি বার করে তাকে খেতে দিল। কি সুন্দর মিষ্টি রুটি—এমন রুটি সে বোধ হয় জন্মেই খায়নি।

খেয়ে দেয়ে বেচারা তো আবার বেরীর সন্ধানে বেরোবে এমন সময় বুড়ি তাকে একটা ঝাঁটা দিয়ে বল্‌ল, "বাছা, আমার জানালাটা বরফে একদম ঢেকে গেছে, একটু ঝেড়ে পরিষ্কার করে দাও দেখি।"

জানালার বরফ পরিষ্কার করে মেয়েটি যা দেখ্‌ল তাতে

একেবারে অবাক কাণ্ড। জানলার তলায় বনের মধ্যে রাশি রাশি বেরী ফলে আছে। বুড়ি বল্‌ল, "তোমার যত ইচ্ছে নাও বাছা, যত খুশী নাও।" বুড়িকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেবে মেয়েটি তো ভেবেই পায় না। বুড়ি তাকে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে তার হাতে ছোট্ট একটা বাক্‌স দিয়ে বল্‌ল, "এই নাও বাছা। এইতে তোমার ভাগ্য রইল। তিন দিন পরে এটা খুলো।"

আসলে বুড়ি যে-সে নয়—একেবারে ভাগ্যবুড়ি। লোকের ভাগ্য ঠিক করাই তার কাজ। মেয়েটি অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বুড়িমা, আমারও কি ভাগ্য আছে?"

ভাগ্যবুড়ি বল্‌ল, "কেন থাকবে না বাছা? সকলেরই আছে, তোমারই বা থাকবে না কেন? তবে যোগাড় করে নিতে হয়।"

এই বলে ভাগ্যবুড়ি উধাও হয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে তার কুঁড়েও অদৃশ্য হয়ে গেল। আর মেয়েটি দেখ্‌ল সে বন ছাড়িয়ে একেবারে বাড়ির সামনে এসে গেছে।

সৎমা কিন্তু বেরীগুলো পেয়ে একটি ভাল কথাও শোনাল না তাকে। বরঞ্চ আশ্চর্য হয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এই বাঁদরী, কোথা থেকে পেলি এগুলো?"

তখন মেয়েটি সব কথা একে একে খুলে বল্‌ল—পথের কষ্টের কথা, ভাগ্যবুড়ির কথা, তার বাক্‌সের কথা।

সৎমা তো রেগেই আগুন। ঐ ঠাণ্ডায় মেয়েটা কোথায় জমে মরবে, তা নয় দিব্যি সৌভাগ্যের ঝোলা পেয়ে গেল! আর তার নিজের মেয়ে? ওকেও পাঠাতে হবে। ওর ভাগ্য কি আর এই রকম ছোট্ট বাক্‌সে ধরবে? লোভে তার চোখ

চক্ করে উঠ্‌ল। সে নিজের মেয়েকে বল্‌ল, "যা না
ছা, তুই একটা এর চেয়েও বড় বাক্স চাইবি।"

সুতরাং বাবু মেয়েটা চল্‌ল বনে বেরী কুড়োতে। তার
ায়ে নতুন জুতো, গায়ে গরম জামা, গলায় পশমের কম্ফর্টার,
াতে ফুলতোলা দস্তানা আর সঙ্গের ঝোলায় সুন্দর সুন্দর
িষ্টি মিষ্টি কেক্।

পথে যেতে যেতে পাজী মেয়েটা এসে উপস্থিত হল
াগ্যবুড়ির ঘরে। কোন দ্বিধা না করে সে সটান ঘরের মধ্যে
কে গেল। তারপর আগুনের পাড়ে বসে আপন মনে কেক্
েতে লাগ্‌ল। এমন কি ভাগ্যবুড়িকে একটা নমস্কার পর্যন্ত
ন করল না। ভাগ্যবুড়ি তার দিকে দেখতে দেখতে বল্‌ল,
বাছা, আমায় একটু কেক্ দাও না।"

মুখে কেক্ ঠেসে মেয়েটা উত্তর দিল, "কিচ্ছু পাবে না।
া, না।"

খেয়ে দেয়ে একটু জিরিয়ে সে ভাগ্যবুড়িকে বল্‌ল, "কই,
আমাকে বেরী দাও। তোমার কাছে বসে থাকবার ইচ্ছে
আর সময় নেই আমার।"

ভাগ্যবুড়ি বলল, "আচ্ছা, আগে আমার ছাতটা ঝেড়ে
দাও।"

—"কি? আমার মায়ের বাড়িতে আমি কখনও মেঝেই
ঝাঁট দিই না, আর এই বরফে বেরোব আমি? এই আমার
ঝোলা রাখলুম, শীগ্‌গির বেরী এনে দাও।" বলল মেয়েটি।

ভাগ্যবুড়ি আর কি করে। হাত থেকে ঝোলাটা নিয়ে
ঠুকঠুক করে বেরিয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে ঝোলাভর্তি
বেরী এনে মেয়েটিকে দিয়ে বল্‌ল, "যাও বাছা। বাড়ি যাও।"

কিন্তু সে নড়বার পাত্রীই নয়। বলল, "আর সৌভাগ্যের বাক্স কোথায়? সেটা দাও।"

তখন ভাগ্যবুড়ি তাকে একটা বাক্স দিয়ে বলল, "ওটা কিন্তু এক বছরের আগে খুলো না বাছা।

পাজী মেয়েটা তো আহ্লাদে ডগমগ হয়ে ছুটে বাড়ি ফিরে এল। কোন রকমে বেরীর ঝোলা আর বাক্সটা ঘরে ঢুকিয়ে রেখেই মা আর মেয়েতে মিলে জল্পনা-কল্পনা করতে লাগ্‌ল কি আছে বাক্সের মধ্যে—নিশ্চয়ই ভীষণ ভাল কিছু একটা হবেই। মাঝের মধ্যে বেচারা সৎমেয়ে খাটতে খাটতে মরে আরকি। পায়ের উপর পা তুলে হুকুম হচ্ছে, 'এটা কর্', 'ওটা আন্', 'খোল দেখি', 'বন্ধ কর্'—এমনি আরও কত সাত সতেরো।

তিনদিনের দিন সন্ধ্যেবেলা একজন অচেনা লোক ঘোড়ায় চেপে এদের বাড়ি এসে উপস্থিত হল।

বুড়ি মা আর তার আদুরে মেয়ে তো তার দিকে চেয়েই দেখল না। কোথাকার কে তার নেই ঠিক—আবার রাতে থাকতে চায়। আবদার আর কি। কিন্তু বেচারা দুঃখী মেয়ের দুঃখ হল তার জন্য। আহা! বাইরে বরফ পড়ছে, কাছাকাছি বাড়িও তো নেই আর! বিদেশীকে সে নিয়ে গেল তার নিজের ঘরে, সেদিনের আনা বেরীগুলো খেতে দিল তাকে, তারপর নিজের ছেঁড়াখোঁড়া কম্বলটা তাকে দিয়ে নিজে গোলা-বাড়িতে শুতে গেল।

এমন অসময়ে বেরী দেখে তো বিদেশী অবাক্। পরের দিন সে মেয়েটিকে সে কথা বল্‌ল। মেয়েটি তো তার কথা শুনে লজ্জা পেল। তার অন্য কিছু খাবার তো নেই।

তখন বিদেশী হেসে বল্‌ল যে সে এক রাজ্যের রাজপুত্র।

দেশ দেখতে বেরিয়েছে। তাকে দেখে তার খুব পছন্দ। রানী করলে তাকেই করবে সে রানী।

এই না শুনতে পেয়ে বুড়ি আর তার মেয়ে তো লাফিয়ে উঠল। মেয়েটা তার বেরীর ঝোলা নিয়ে এসে রাজপুত্রকে দিয়ে বল্‌ল, "খেয়ে দেখ, কি মিষ্টি। আমি কত ভাল, কত সুন্দর দেখ, আর আমি থাকতে কিনা তুমি রানী করবে ঐ হতচ্ছাড়ীকে!"

রাজপুত্র তো দুয়েকটা বেরী মুখে দিয়েই 'হ্যাক থুঃ' করে ফেলে দিতে পথ পায় না—যেমন শক্ত, তেমনি টক্ আর তেমনি তেঁতো—বেরী তো নয় যেন বিষ।

গতিক্ সুবিধের নয় দেখে পাজী মেয়েটা বল্‌ল তার বোনকে, "রাজপুত্রকে বিয়ে করবি তুই? হাঁ করে দেখছিস কি? যা, যা তোর ভাগ্যের বাক্‌সটা নিয়ে এসে খোল দেখি দেখবি তাতে রয়েছে পেঁজা তুলো আর তকৃলি—সুতো কেটেই জীবন কাটাতে হবে তোকে।"

সে বেচারা আর কি করে। আস্তে আস্তে বাক্‌সটা খুল্‌ল সে। বাক্‌সের মধ্যে কি......একটা সুন্দর মুকুট।

রাজপুত্র মুকুটটা তুলে তার মাথায় পরিয়ে দিল। কি সুন্দর তাকে মানাল যে—ঠিক যেন মাপে মাপে! তখন রাজপুত্র তার ঘোড়ায় করে সদ্যপাওয়া রানীকে নিয়ে রাজধানীর দিকে চলে গেল।

পাজী মেয়েটা তখন তাড়াতাড়ি তার সুন্দর সাজানো বাক্‌সটা নিয়ে এসে খুলে ফেল্‌ল। আর হল্‌কা দিয়ে ঝলকে ঝলকে আগুন বেরিয়ে এল তা থেকে। ভয়ে সে তো বাক্‌সটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। অমনি দাউ-দাউ করে সমস্ত

বাড়িটায় আগুন ধরে গেল। মায়ে মেয়েতে কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে বাইরে চলে এল। একটু একটু করে গোলাবাড়ি, খেত, খামার সব জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গেল। • •

কি আর হবে? কুঁড়ে পাজী মেয়েটাকে শেষে কাজ করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে হল।

শেষ পর্যন্ত নিজে খেটে এক টুকরো রুটি জোগাড় করা যে কত কষ্টের সে বুঝতে পারল। সকলেরই তো তা জানা উচিত, নয় কি?

জমিদারের সাজা

একদিন এক রাখাল গরু চরাচ্ছে আর তার বাবা মাঠে লাঙল দিচ্ছে এমন সময় এক জমিদার ঘোড়ায় চেপে টগ্‌বগিয়ে তার দিকে এলেন। জমিদার মশাই ঠিক জমিদারী চালে এলেন—নাক তাঁর উঁচু, পেটটা নাদা, পাগুলো লিক্‌লিকে। চোখ বড় বড় করে তিনি রাখালকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই ছোঁড়া! ঐ চাষাটা কি করছে রে?"

রাখাল উত্তর দিল, "হুজুর, উনি আমার বাবা। জমির পোশাকটা পাণ্টাচ্ছেন। বাইরের আস্তরণটা বড় পুরনো হয়ে গেছে কিনা, তাই সেদিকটা ভিতরের দিকে দেওয়া হচ্ছে।"

জমিদার অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "সে আবার কি?"

—"এটা বুঝলেন না! শুনুন, আমার বাবা ক্ষেতটা চষছেন। লাঙল না দিলে বোকা জমিদারটা তো আর টাকা পাবে না।"

জমিদার মশাইয়ের তো রাখাল ছেলের এ কথাগুলো শুনতে মোটেই ভাল লাগল না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর মা কি করছে রে?"

—"ওঃ! তিনি তো খাওয়া রুটি সেঁকছেন।"

আবার আশ্চর্য হয়ে জমিদার মশাই শুধোলেন, "সে আবার কি?"

—"কেন? তবে শুনুন। গত হপ্তায় পাশের বাড়ি থেকে তিনি রুটি চেয়ে এনেছিলেন। আজ এই রুটি তৈরি করে শোধ দেবেন। তিনি শোধ দেবেন, আবার ধার করবেন

—এমনি চলবে যাতে আমার বাবা আপনার জমি চাষ করতে পারেন।"

—"বটে! তা তোর বোন কি করছে?"

—"দিদি তো তার বিয়ের সময়-গাওয়া গানগুলোর জন্য কাঁদছে, জমিদার মশাই।"

—"কেন? কেমন করে?"

—"শুনুন তবে। গত বছর যখন তার বিয়ে হল, সব সময় সে গান গেয়ে কাটিয়েছিল। এ বছর তার একটা ছেলে হয়েছে। ওকে খাওয়াবার কিছুই নেই দিদির। ঐ জন্য সে কাঁদছে। তাছাড়া তার স্বামীকে তো আপনি সৈন্যদের হাতে তুলে দিয়েছেন।"

জমিদার মশাইয়ের রাখালের এই কথাবার্তা মোটেই পছন্দ হল না। তিনি একবার নিজের হাতের ঘোড়ার চাবুকটা আর একবার রাখালের হাতের মোটা ডাণ্ডাটা দেখলেন। মনে মনে ভাবলেন, দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা। কেমন করে আমার মত জমিদারের সঙ্গে কথা কইতে হয় ঘাড় ধরে শেখাব তোকে। মুখে তিনি নরম স্বরে বললেন, "শোন্ ছোক্‌রা, কাল আমার কাছারিতে যাস্। তোর এমন জবাবের জন্য তোকে খাতির-যত্ন করা যাবে।"

রাখাল বলল, "বেশ তো, যাব না কেন?" পরের দিন জমিদার মশাই চোখ মেলতে না মেলতেই রাখাল এসে হাজির।

জমিদার মশাই বললেন, "আমার গুদোমঘরে যা। ওখানে আমার চাকর তোর অভ্যর্থনা করবে।" লুকিয়ে লুকিয়ে চাকরকে হুকুম দেওয়া হল চাবুক নিয়ে যেতে সঙ্গে করে।

চাকরের সঙ্গে রাখাল তো চলল। জামার কোণা থেকে চাবুকের ডগা বার হয়ে থাকতে দেখে রাখালভায়া ব্যাপারটা বুঝে নিল—কেমন অভ্যর্থনা তাকে দেওয়া হবে।

গুদোমঘরে পৌঁছে চাকরটা রাখালকে বলল, "ওহে ছোকরা সামনের ঐ পিপেটার ছিপি খুলে যত পার মদ খাওগে যাও।"

রাখাল বলল, "আমি তো ছিপি কেমন করে খোলে জানি না। একটু দেখিয়ে দাও না ভাই।"

চাকর বেচারা নীচু হয়ে পিপেটা তুলে ছিপি খুলল; কিন্তু ইতিমধ্যে জামার তলা থেকে রাখাল চাবুকটা বার করে নিয়ে ওকেই মারতে আরম্ভ করে দিয়েছে। চাকরটা ভয়ে পিপের খোলা মুখ থেকে আঙ্গুলটাও সরাতে পারছে না—পাছে অমন দামী মদ হড়হড় করে বেরিয়ে যায়। মার খেতে খেতে সে শেষপর্যন্ত জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল। রাখাল তখন এক টুকরো ভাল মাংস তার জামার পেছনে লুকিয়ে নিয়ে বার হয়ে এল।

জানালার ধারে জমিদার মশাই দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাখালকে পিঠে হাত দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখে তিনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে প্রশ্ন করলেন, "কেমন, আমার খাতিরে সন্তুষ্ট তো? কোনো ত্রুটি হয় নি?"

—"ওঃ! না, না, জমিদার মশাই। এ আমার একশ বছর মনে থাকবে।"

ধীরেসুস্থে রাখাল বাড়ির বাইরে চলে যাবার পর যখন চাকরটা টলতে টলতে বেরিয়ে এল তখন জমিদার মশাইয়ের রাগ দেখে কে? হায়, হায়। শেষে তাঁর চাকরই কিনা

মার খেল। এমন করে বোকা বানিয়ে গেল তাঁকে পাজি রাখালটা।

পরের দিন জমিদার মশাই ঘোড়ায় চেপে রাখালের সন্ধানে চললেন। রাখাল একটা পাত্রে করে তার বাপের জন্য সুপ নিয়ে যাচ্ছিল মাঠে। দূর থেকে চাবুক হাতে জমিদারকে আসতে দেখে সে ব্যাপারটা বুঝল। একটা গাছের গুঁড়িতে সুপের পাত্রটা রেখেই এক দৌড়ে সে কামারের চুল্লী থেকে গনগনে লোহার একটা টুকরো এনে ঐ পাত্রে ফেলে দিল। আগুন পেয়ে ঝোলটা আবার টগবগ করে ফুটতে লাগল আর তা থেকে ধোঁয়াও বেরতে লাগল। ঝোল যত উপচে উপচে পড়ছে ততই রাখাল সেই গাছের গুঁড়িটার চারদিকে ঘুরপাক খেতে লাগল।

কাছে এসে জমিদার মশাই তো অবাক। গাছের গুঁড়ির চারপাশে রাখাল ছুটে ছুটে ঘুরছে, সারা গা বেয়ে ঘাম ঝরছে আর ওদিকে ঝোলও ফুটতে ফুটতে চল্‌কে চল্‌কে পড়ে যাচ্ছে। আগুন ছাড়া কেমন করে ঝোলটা হচ্ছে ?

হাঁদারামের মত তিনি প্রশ্ন করলেন, "কি করছিস রে ?

—"ঝোল গরম করছি, হুজুর।"

—"সে কিরে ? আগুন কই ?"

—"কেন ? গাছের গুঁড়িতে রেখে আমি যেই চারপাশে দৌড়ব অমনি ঝোল ফুটবে—এমনই গুণ।"

জমিদার মশাই ঘোড়া থেকে নেমে ঝোল চেখে দেখেন—চমৎকার !

এমন জিনিস না কিনলেই নয়। বন্ধুবান্ধবদের দেখিয়ে বাহবা পেতে হবে তো।

রাখাল কিন্তু কিছুতেই সেই পাত্রটা হাতছাড়া করবে না। তাহলে তার চলবে কি করে? জমিদার মশাই টাকাকড়ির সঙ্গে তাঁর ঘোড়াটাও দিতে চাইলেন।

তখন রাখাল জমিদারকে সেই অদ্ভুত পাত্রটা দিয়ে ঘোড়ায় চেপে টাকার টুংটাং আওয়াজ করতে করতে সরে পড়ল।

জমিদার মশাইও বাড়ি ফিরে এলেন। রাজ্যিশুদ্ধ মানী-গুণী লোকদের নেমন্তন্ন করা হল। পাত্রটার দিকে তাকিয়ে জমিদার মশাই ভাবলেন পাজী রাখালটাকে কি ঠকানোই না ঠকালাম। একটা গাছের গুঁড়ির উপর পাত্রটা রেখে তিনি একজন চাকরকে চারধারে ছুটতে বললেন। ছুটে ছুটে কিছুতেই আর ঝোল ফোটে না। জমিদার মশাই তখন তার কোচোয়ানকে পাঠালেন। সে বেচারা ঐ চাকরের পিছু পিছু ঘুরতে লাগল। এতেও কিছুই হল না। কুকুরের দেখাশুনা করবার লোকটাকে তখন পাঠান হল। তিনজনে জিভ বার করে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটতে লাগল। কিন্তু কিছুই হল না।

তখন বোকা জমিদার নিজেই ছুটতে লাগলেন। তাঁর আগে কুকুর দেখাশোনা করবার লোকটা, তারও আগে কোচোয়ান, আর সবার আগে চাকরটা—ঘুরছে আর ঘুরছে, ছুটছে তো ছুটছেই......

এইবার সমবেত লোকেরা হো হো করে হেসে উঠল। সকলে হেসে দু টুকরো হয়ে যাবার জোগাড়—"হিঃ হিঃ, হোঃ হোঃ,"—পেটে হাত দিয়ে সবাই হাসছে। মেয়েরা হেসে অজ্ঞানই হয়ে পড়ল। জমিদার মশাই তবু ছুটছেন। কিন্তু এততেও ঝোল আর ফুটল না।

কে জানে, তিনি হয়তো এখনও ছুটছেন!

তারা পাঁচ ভাই

এক বিধবার পাঁচ ছেলে। বড় কষ্টে দিন কাটে, খাওয়াই হয় না কতদিন। শেষে বড় চার ভাইয়ের কাজ জুটল। ছোট ছেলে মায়ের কাছেই রইল। অপর চার ছেলে কোথায় রইল, কেমন রইল, কি কাজই বা শিখল মা কিছুই জানতে পারে না।

ছোট ছেলে দিনের পর দিন বড় হয়ে উঠতে লাগল—ভাল খেতে তো তবু পাওয়া যায় না। সাতবছর যখন তার বয়স তখনই সে জমিদারের সাতমন ওজনের গমের বস্তা ঘাড়ে তুলতে পারে। যতই তার বয়স বাড়ে ততই তার গায়ের জোরও হু হু করে বাড়তে লাগল। বনে কাঠ আনতে গিয়ে সে লম্বা লম্বা গাছগুলো ধরে এক এক টান মারে আর সেগুলো শেকড় নিয়ে উপড়ে উঠে আসে। শেষে লোকেরা তার নাম দিল, 'অতিশক্তি'।

একদিন অতিশক্তি বাড়ি থেকে বেশ দূরে কাঠ আনতে গিয়ে একটা গাছের গোড়া ধরে টান লাগাবার উপক্রম করেছে এমন সময় দেখে কিনা একজন শিকারী বন্দুক হাতে গাছটার পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে।

অতিশক্তি তাকে নমস্কার করে বলল, "কি দাদা, আপনার কেমন চলছে ?"

শিকারী উত্তর দিল, "ভাল, আবার কেমন ? আমার চোখও যেমন, টিপও তেমন। নামও আমার 'অতিদৃষ্টি'। এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে, একটা ওক গাছ আছে।

তার উপর একটা মশা বসেছিল, আমি এক গুলি মেরে তার বাঁ চোখটা কানা করে দিয়েছি।"

সত্যিমিথ্যে পরখ করার জন্য দুজনে একসঙ্গে চলল দেখতে। রাস্তা তো বেশ খানিকটা, কাজেই খুব গল্প চলতে লাগল। অতিশক্তি তার বন্ধুকে তার বাড়ির কথা, মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করল। অতিদৃষ্টি বলল তারা পাঁচ ভাই। টাকার অভাবে তার মা চার ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়ে ছোট ছেলেকে কাছে রেখেছে।

অতিশক্তি বলল, "আরে, আরে। তাহলে তো তুমি নিশ্চয়ই আমার দাদা।"

দুজনের দেখা হওয়াতে খুবই আনন্দ হল। কথা বলতে বলতে কেমন করে যে পনের মাইল পথ কেটে গেল তারা বুঝতেই পারল না। হঠাৎ তারা দেখতে পেল একটা লোক টুপিটা একধারে কাত করে হাঁটতে হাঁটতে তাদের দিকে আসছে। সে আবার সুন্দর শিস্ দিচ্ছে। এরা দুভাই তাকে জিজ্ঞাসা করল কোথায় সে যাচ্ছে আর কেনই বা টুপিটা অমন কায়দা করে হেলিয়ে দিয়েছে।

সে জবাব দিল, "আরে ভায়া, অন্য সকলের মত যদি আমি টুপিটা পরি এখনই ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ে যাবে, বরফের টুকরো ঝুলবে এই টুপির গা থেকে।"

ওরা দেখল এও তো বেশ কাজের লোক। একে সঙ্গে পেলে ভালই হয়। সেও রাজী হয়ে গেল।

পথে যেতে যেতে কথাবার্তায় পরিচয়ে জানা গেল এ-ই তাদের হারানো মেজ ভাই 'অতিশীত'। তখন অতিশক্তি

বল্‌ল, "আরে বেশ মজা তো। তুমিই আমার দাদা।" সকলেই খুব আনন্দিত মনে চলল।

কিছুদূর গিয়ে তারা দেখতে পেল একটা খুব লম্বা-চওড়া লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে একটা জাঁতা বাঁধছে।

ওরা ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করল, "কি মশাই, ওইটা পায়ে থাকলে কি আপনার হাঁটতে সুবিধা হয়?"

লোকটা বল্‌ল, "ও ছাড়া আর উপায় নেই। পাথরটা খুলে ফেললেই আমি এত জোর ছুটতে আরম্ভ করব যে কয়েক মুহূর্তেই সমস্ত পৃথিবী ঘোরা হয়ে যাবে।"

তিন ভাই দেখল এও তো বেশ কাজের। তারা বলল, "চলুন আমাদের সঙ্গে।"

—"বেশ তো", বলে নতুন লোকটিও চল্‌ল।

এ লোকটির নাম 'অতিগতি'। তার নামধাম ঠিকানা নিতে নিতে জানা গেল এও তাদের মায়ের পাঁচ ছেলের একজন, অতিশক্তির সেজ ভাই। সকলেই তো খুব আনন্দের সঙ্গে পথ চলতে লাগল। পঁয়তাল্লিশ মাইল পথ তখনই তারা পেরিয়ে এসেছে।

যেতে যেতে তারা দেখতে পেল আর একটা লোককে। সে আবার তার নাকের একটা ফুটো বন্ধ করে রেখেছে।

—"আপনি কি এক নাকে ভাল নিঃশ্বাস নিতে পারেন?"

—"ভালভাবে না নিলেই বা কি, নাক খুললে এত জোর হাওয়া বইবে যে সে ঝড়ের মুখে বড় বড় গাছও উড়ে যাবে।"

সকলে তার দিকে তাকাল—এও তো দেখছি বেশ কিছু জানে।

অতিশক্তি জিজ্ঞাসা করল, "আপনার মায়ের কি পাঁচ ছেলে ?"

লোকটি উত্তর দিল, "হ্যাঁ পাঁচজন।"

—"তবে তো তুমি আমার ন' দাদা।"

তখন তারা পাঁচজনে চলল। বাকী পাঁচ মাইল চলে সত্যিসত্যিই ওকগাছের তলায় দেখতে পেল মশা একটা পড়ে রয়েছে। অতিদৃষ্টি তার বাঁ চোখেই গুলিটা লাগিয়েছে।

পাঁচ ভাই খুব অবাক হয়েই ভাবতে লাগল কেমন অদ্ভুত অদ্ভুত ক্ষমতা তাদের প্রত্যেকের আছে। বাড়ি ফিরে আসলে তাদের মা তো আহ্লাদে আটখানা।

কয়েকদিন জিরিয়ে নিয়ে তারা ঠিক করতে লাগল কেমন করে টাকা রোজগার করা যায়—খেতে হবে তো নিজেদের, মাকেও খাওয়াতে হবে। তাই তারা আবার বেরিয়ে পড়ল কাজের খোঁজে।

এক রাজপ্রাসাদে এসে তারা শুনল যে রাজা ঘোষণা করেছেন, যে রাজকন্যাকে দৌড়ে হারাতে পারবে সেই হবে রাজকন্যার স্বামী। অতিগতি শুনে ভাবল এতো তারই কাজ। কাজেই সে রাজকন্যার সঙ্গে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নামল।

রাজা রাজকন্যা আর অতিগতি দুজনকে দুটো মস্ত বড় হাতা দিয়ে বললেন সেই পুবদিকে যেখানে সূর্য ওঠে—সেখানকার ঝরণা থেকে জল নিয়ে আসতে। যদি অতিগতি রাজকন্যার আগেই জল নিয়ে ফিরে আসতে পারে তবে পরের দিনই বিয়ে হবে।

বেশ, তাই হবে। রাজকন্যা যত জোর পারে ছুটল।

আর অতিগতি দুপা ছুটেই একেবারে সেই ঝরণার ধারে এসে উপস্থিত।

হাতাতে জল ভর্তি করে, পেট পুরে জল খেয়ে অতিগতি দেখল তাড়াতাড়ি নেই কিছুই, কাজেই সে শুয়ে পড়ল। মুখে রোদ পড়ছিল। বেল্টটা খুলে মুখে টুপি চাপা দিয়ে সে ঘুমোতে লাগল। এমন সময় রাজকন্যা ছুটতে ছুটতে এলো, জল ভর্তি করল, অতিগতির হাতাটা উল্টে অনেক দূরে ছুঁড়ে ফেলে ভাবল, "হুঁঃ, বামন হয়ে চাঁদে হাত, আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা,"—এই ভেবে যত জোরে পারে আবার ফিরে চল্‌ল।

রাজা এদিকে বসে বসে অপেক্ষা করছেন। চার ভাইও অপেক্ষা করছে তো করছেই। অতিগতি আর আসে না—বেলাও ওদিকে পড়ে আসছে। অতিদৃষ্টি নজর করে দেখল অতিগতি ঝরণার ধারে ঘুমোচ্ছে, হাতাটা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর রাজকুমারী ভীষণ জোরে ছুটে আসছে, পেছনে তার ধুলো উড়ছে।

অবস্থা বড়ই সঙ্গীন! অতিদৃষ্টি খুব টিপ করে এক গুলি ছুঁড়ে অতিগতির টুপিটা উড়িয়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে অতিগতির ঘুম গেল ভেঙ্গে। তাড়াতাড়ি উঠে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েই হাতাতে আবার জল ভরে সে ছুট লাগাল। এক! দুই!—ব্যাস্ রাজকন্যাকে ছাড়িয়ে সে একেবারে রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে বল্‌ল, "কেমন, মহারাজ, সন্তুষ্ট?"

রাজামশাইকে তো এখন অতিগতির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হয়—কথা দিয়েছেন তিনি। রাজকন্যা অতিগতি আর তার চার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ

দেখেই বুঝল ওরা সামান্য চাষা। অবজ্ঞায় নাক সিঁটকাল। রাজাও এমন জামাই চান না, ইচ্ছে আছে কোনো রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবেন রাজকন্যার। সুতরাং রাজা গম্ভীরভাবে অতিগতিকে বল্লেন, "আমার মেয়েকে বিয়ে করে তুমি কি করবে? রাজকন্যার সঙ্গে কেমন করে কথা কইতে হয় তাই তো তুমি জান না। তার থেকে তুমি যত খুশী জিনিসপত্র নিয়ে বিদেয় হও।"

অতিগতি তাতেই রাজী। সকলে মিলে শহরের সব কাপড় জোগাড় করল। আর অতিশক্তি একটা থলি তৈরি করতে শুরু করে দিল। তিনদিন ধরে সেলাই করে একটা বিরাট থলি তৈরি হল। সেই থলি দেখে রাজামশাইয়ের চোখ তো উঠে গেল কপালে—ওর মধ্যে স—ব জিনিস ঢোকাবে নাকি? কেমন করে পাঁচ ভাইয়ের হাত এড়ানো যায় তার ফন্দি তিনি আঁটতে লাগলেন।

রাস্তার ধারে একটা স্নানাগারে পাঁচ ভাইকে তিনি স্নান করতে আদেশ দিলেন। ঐ ঘরটা ছিল লোহার—ওখানে ঢুকলে আর মানুষ বাইরে আসতে পারে না।

অতিশীত প্রথমে ঢুকল ঘরে, পেছনে অন্য চার ভাই। সোজা করে টুপিটা দুকানের উপর বসিয়ে দিতেই গরম জল ঠাণ্ডা হতে লাগল, ভাইয়েরা শীতে জমে যাবার ভয়ে জড়াজড়ি করে ঠকাঠক্ কাঁপতে শুরু করে দিল।

রাজবাড়ির চাকরেরা চুল্লীতে গাদাগাদা শুকনো কাঠ ঢালতে লাগল। রাজা খুশি হলেন ওদের আর কিছু দিতে হবে না ভেবে। অনেকক্ষণ ধরে অমনি গরম রেখে শেষে স্নানঘরের দরজা খুলে দেওয়া হল।

পাঁচ ভাই তাড়াতাড়ি বেরিয়েই মোটা কাপড়চোপড় গায়ে দিতে দিতে বল্‌ল, "উঃ কি ঠাণ্ডা!"

রাজা তো অবাক। এ আবার কি? কেমন ভাই এরা! কেউ হারাতে পারবে না এদের।

পাঁচ ভাই তাড়াতাড়ি থলিটায় অনেক জিনিসপত্র ভরতে লাগল। শেষে সাতটা গাড়ি বোঝাই করে, ঘোড়া সইস নিয়ে, ঘোড়ার জন্য সাত থলি ছোলা আর চাকাতে লাগাবার জন্য সাত বালতি তেল নিয়ে অতিশক্তি তার ভাইদের ফিরিয়ে নিয়ে চল্‌ল।

রাজা তো রেগেই আগুন। মুকুট লাগিয়ে তলোয়ার উঁচিয়ে, সৈন্য সাজিয়ে তিনি ওদের পিছু পিছু চল্‌লেন। জিনিসগুলো কেড়ে নিতেই হবে—তাতে ওদের খুন করতে হয় তাতেও রাজী।

রাজার সৈন্যরা ছুট্‌ল—বর্শা নিয়ে, তলোয়ার নিয়ে, কামান নিয়ে। পাঁচ ভাই তো সব দেখল, সব বুঝল—কি করে তারা?

"ভয় নেই, ভয় নেই", বল্‌ল অতিবায়ু। তারপর তার নাকের আর একটা ফুটো খুলে দিল। আর যায় কোথা? এমন এক ঝড় উঠ্‌ল যে সো সো করে রাজার সব সৈন্য—কি পদাতিক, কি অশ্বারোহী, কোথায় যে উড়ে গেল তা ভগবানই জানেন। কেউ আর মাটিতে পা-ই রাখতে পারল না। কেবল একজন সৈন্য একটা ফার গাছের গুড়ি জড়িয়ে কোন রকমে গাছের সঙ্গে লেপ্‌টে রইল। আজও সে আছে—ছোট পাহাড়টার তলায়; নদীটার পাশে, ক্ষেতগুলোর উপরে, ন'টা গাছের পর বাঁদিকে। ওঃ, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? আচ্ছা দেখে এস তবে।

ইয়ানিসের চাকরি

ইয়ানিস আর তার মা। ইয়ানিসের গায়ে ছিল দারুণ জোর, এত জোর পৃথিবীর কোন লোকের গায়েই ছিল না। চাকরির খোঁজে ইয়ানিস গিয়ে পড়ল এক জমিদারের কাছে। এই জমিদারের মনে মনে ঠিক করা ছিল তার কোন চাকরই পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে যেতে পারবে না।

ইয়ানিস আর জমিদারের মধ্যে কথাবার্তা ঠিক হল। ইয়ানিস সারা বছর কাজ করবে বসন্তকালে কোকিলের ডাক না শোনা পর্যন্ত। মাইনে হিসাবে ইয়ানিস যত নিয়ে যেতে পারে ততই পাবে। আরও ঠিক হল ইয়ানিস কিংবা জমিদার মশাই কেউই কারও উপর রাগ করতে পারবে না। যদি করে তবে তাকে দশবছর অপরের বিনাপয়সার গোলাম হয়ে থাকতে হবে। ইয়ানিস তাতেই রাজী।

চাকরির প্রথম দিন ইয়ানিসকে জমি চষতে পাঠানো হল। জমিদার তাকে এমন একটা ঘোড়া দিল যেটা নিজেই নড়তে পারে না, লাঙল আর টানবে কি? দেখে দেখে ইয়ানিসের মেজাজ গরম হয়ে গেল। ঘোড়াটাকে একটা খাদে ফেলে দিয়ে সে নিজেই লাঙল টানতে শুরু করে দিল। শক্তি আর বুদ্ধির অভাব তো নেই তার। দুপুরের মধ্যেই মাঠটা চষা হয়ে গেল আর সন্ধ্যার মধ্যেই সব মাঠগুলোয় লাঙল দেওয়া শেষ।

জমিদার মশাই দেখেশুনে হাত চাপড়ে বলল, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? কত খড় এই মাঠে হবে, এখন রাখব কোথায়?"

—"তার. আমি কি জানি? রাগ করেছেন নাকি?" গজ-গজ করে জমিদার মশাই বলল, "না, না। রাগ আমি করি নি। তোমার এরকম করা উচিত হয় নি।"

পরের দিন জমিদার হুকুম দিল শুকনো কাঠ জোগাড় করতে। সঙ্গে দিল সেই ঘোড়াটা। বনে গেল ইয়ানিস। এক—দুই—তিন গাড়ি বোঝাই হয়ে গেছে, কিন্তু যা বিশ্রী দেখতে হয়েছে বোঝাটা। কিন্তু ঘোড়াটা আর দেখা যায় না। যখন ইয়ানিস কাঠ কুড়োচ্ছিল তখন ঘোড়াটকে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। ইয়ানিস নেকড়ে বাঘগুলোর লেজ ধরে ঘোড়ার জায়গায় গাড়িতে জুতে দিল। নেকড়েগুলো খুব চাৎকার করতে লাগল, কিন্তু ইয়ানিস তাদের পিঠে খুব ছিপটি লাগাতে লাগল। রাত হয়ে গেছে এমন সময় ইয়ানিস সমস্ত উঠানভর্তি কাঠ এনে নেকড়েগুলোকে খুলে গোয়ালে রেখে দিল। আর রাত্রে নেকড়েগুলো সব গরুবাছুর খেয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

সকালবেলা জমিদার মশাই ব্যাপার দেখে এমনি কাতরাতে লাগল যে মনে হল তাকেই বুঝি দুটুকরো করে কেটে ফেলা হয়েছে। সে বলল, "আরে, তুমি একি করেছ? তোমার মাথার ঠিক নেই। গোয়ালে নেকড়ে রেখেছ?"

—"তা আর কি করব? রাখব কোথায়? ওদের খাবার ছিল না আর ওরা চাকরও নয়। আপনি আমার উপর চটে গেছেন মনে হচ্ছে।"

—"না, না, চটিনি। তবে এরকম করা ঠিক হয় নি।"

এখন জমিদার ইয়ানিসকে ধান ঝাড়ার কাজ দিল। ইয়ানিস উদূখল আর মুষলটা দেখে বলল, "এ-তো ভাল নয়।" এই

না বলে একটা ওক গাছ টেনে নিয়ে সব ডালপালা ঝরিয়ে সে একটা ভাল দেখে উদূখল-মুষল তৈরি করল। তারপর ধানগুলো গর্তে ফেলে খুব জোর জোর মুষল চালাতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাজ সারা হয়ে গেল। কিন্তু সব চাল গুড়িয়ে একেবারে ধুলোর মত হয়ে গেল, আবার এত জোর হাওয়া বইল যে ঝড়ে ঘরটাই ধ্বসে গেল।

তখন জমিদার দেখল ইয়ানিসকে ঠকানো যাবে না। ওকে কেমন করে তাড়ানো যায় সেই চেষ্টাই করা যাক।

ইয়ানিসকে তিনটে পিপে দিয়ে জমিদার তাকে পাঠাল তার আত্মীয়ের কাছে—ঐ পিপেগুলোর চারধার লোহার পাত দিয়ে মুড়ে দিতে। কিন্তু যে বনে ঐ আত্মীয় থাকে বলল, সেই বনে আসলে আছে একটা ভীষণ ভাল্লুক। ইয়ানিস তার কিছুই জানে না। নেকড়েগুলো গাড়িতে জুতে পিপেগুলো সে বোঝাই করল, তারপর ছিপটির বদলে একটা লোহার শেকল নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। রাস্তায় নেকড়েগুলো আর যেতেই পারে না—গাড়িটানা তো আর গরুবাছুর মারার মত সোজা নয়। ইয়ানিস রেগে গিয়ে চাবুকের মত শেকলটা দিয়ে এক বাড়ি মারল—খুব জোর নয়, আস্তে আস্তেই। আর নেকড়েগুলোর কি হল? ইয়ানিস কি ছাই জানে। দেখা গেল কেবল গাড়ির জোয়ালটা রয়েছে। কি আর করা যায়? ইয়ানিস নিজেই গাড়িটা টেনে নিয়ে চলল।

বনের কাছে পৌঁছতেই ভাল্লুকটা গর্জন করে ইয়ানিসের দিকে তেড়ে এল।

ইয়ানিস ভাবল এই বুঝি সেই পিপেসারানেওয়ালা। সে

বলল, "নমস্কার! আপনার জমিদার আত্মীয় এই পিপেগুলো লোহা মোড়বার জন্য পাঠিয়েছেন।"

কিন্তু ভাল্লুকভায়া তার অভিবাদন গ্রহণ না করে তাকে চিপটে মারবার জন্য এগিয়ে আসতে লাগল। ইয়ানিস আর কি করে? ভাল্লুকটাকে ধরে সে বলল, "বটে, এমনিভাবে আপনি পিপে সারেন! আচ্ছা দেখাচ্ছি মজা। এখন আমার গাড়ি টানুন দেখি।" এই না বলে ভাল্লুকটাকে জোয়ালে লাগিয়ে নিজে গাড়িতে বসে কয়েক ঘা শেকলের বাড়ি লাগাতেই ছুটে ভাল্লুক একেবারে জমিদারের এলাকায় হাজির।

—"ও জমিদার মশাই! এই পিপেসারানেওয়ালাকে রাখব কোথায়? এ যে কিছুই জানে না, আবার লড়াই করতে আসে," বলে ইয়ানিস।

ভয়ে ভয়ে জমিদার বলল, "যেখানে খুশী রাখ ওকে।" ইয়ানিস আস্তাবলে ভাল্লুকটাকে রেখে আর কি কাজ করতে হবে জানতে চাইল।

জমিদার বলল, "গোলাতে গম রয়েছে থলি ভর্তি। আমার আত্মীয়, ময়দাওয়ালার কাছ থেকে কাল ওগুলো ভাঙ্গিয়ে নিয়ে আসবে।"

সকালবেলা আবার ভাল্লুকটাকে গাড়িতে জোড়া হল। গমের থলিগুলো গাড়িতে চাপিয়ে তার উপর বসে ইয়ানিস গাড়ি চালিয়ে দিল। এদিকে ময়দাকলের মালিক হচ্ছে একটা ন'মাথাওয়ালা দৈত্য।

ইয়ানিস পৌঁছেই হাঁক ছাড়তে লাগল, "কে আছেন, কে আছেন?"

ময়দাওয়ালার বদলে বেরিয়ে এল একটা ক্ষুদে শয়তান।
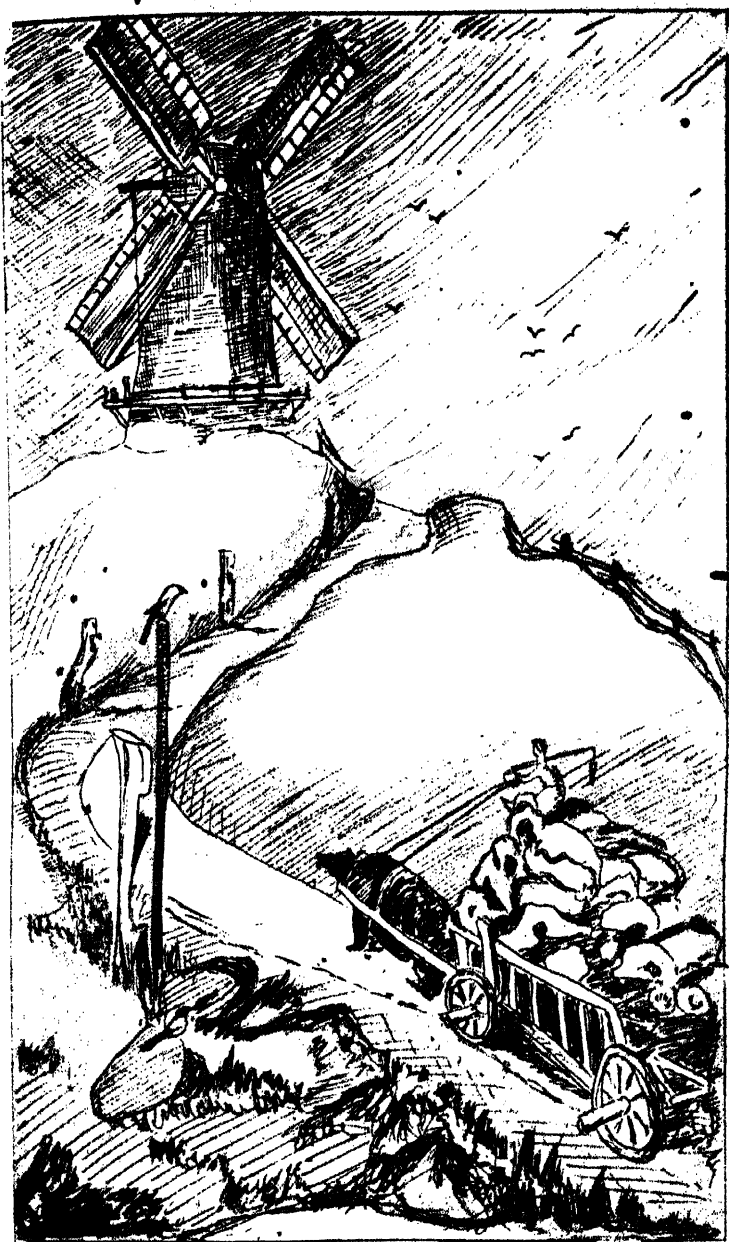
শেকলটা তার নাকের ডগার সামনে ঘুরিয়ে ইয়ানিস বলল, "তোমার মালিককে চাই।"

ছেলেটা ভয়ে পালিয়ে গিয়ে ডেকে আনল একটা তিন-মাথাওয়ালা দৈত্যকে। ইয়ানিস জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে?"

—"আমি এই ময়দাকলের একজন কর্মচারী।" ইয়ানিস শেকলটা এত জোর মাটিতে আছড়ে ফেলল যে ভীষণ শব্দ করে জায়গাটা কেঁপে উঠল। এ দৈত্যটাও ভয়ে পালাল।

তখন ন'মাথাওয়ালা দৈত্য নিজেই রাগে গরগর করতে করতে বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করল, "কি চাও তুমি?"

ইয়ানিস তাকে ভাল করে দেখে বলল, "এই গমগুলো গুঁড়িয়ে ময়দা করে দাও। না হলে মাথা কেটে নেব সব।"

থলিগুলো টেনে ভিতরে নিয়ে যেতে যেতে দৈত্য ভাবল গতিক সুবিধের নয়, এ বড় শক্ত ঠাঁই।

দুপুরের মধ্যেই ইয়ানিস ময়দা নিয়ে ফিরে এল। জমিদার ভাবল নিশ্চয়ই দৈত্যটা সে সময় ছিল না। যাইহোক এবার ইয়ানিসকে দৈত্যটাকে এখানে ধরে নিয়ে আসতে বলা যাক। ওকে ধরতে গেলেই বাছাধনের কারসাজি সব যাবে।

সকালবেলাই ইয়ানিস ময়দাকলে গিয়ে উপস্থিত। কিন্তু দৈত্য কি আর তার কথা শোনে! সে চেষ্টা করতে লাগল জটাপটি করে ইয়ানিসকে জাঁতায় ফেলে গুঁড়িয়ে দিতে। কিন্তু ইয়ানিস তার হাত চেপে ধরে বলল, "বটে, গুঁড়ো করতে চাও আমায়। চল, এখন গাড়ি টানবে।"

ভাল্লুকের আগে ন'মাথাওয়ালা দৈত্যকে লাগিয়ে ইয়ানিস শেকলের দুই ঘা লাগাল দৈত্যের পিঠে আর এক ঘা ভাল্লুকের

গায়ে। আর দেখতে না দেখতে গাড়ি পৌঁছে গেল জমিদারের বাড়ি।

ইয়ানিস বলল, "যেমন ময়দাওয়ালা তেমন পিপেসারানে-ওয়ালা। কেউই কাজ করবে না। যাইহোক, কাল আমার কাজ ঠিক করে রাখবেন হুজুর।"

জমিদার দেখল ন'মাথাওয়ালা দৈত্য আর ভাল্লুককে যদি জব্দ করে থাকে ইয়ানিস তবে সে ওর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। বরঞ্চ ভালয় ভালয় ওকে তাড়াতে পারলে বাঁচা যায়।

জমিদার তার শাশুড়ীকে একটা গাছে চড়ে 'কু-কু' করে ডাকতে বলল। ইয়ানিস তাহলে ভাববে বছর শেষ হয়েছে আর চলে যাবে।

যেমন বলা তেমনি কাজ।

রাতদুপুরে ইয়ানিস শুনল, 'কু-কু, কু-কু'। বিছানায় এপাশ ওপাশ করে ঘুম আর হয় না ইয়ানিসের। শেষে উঠোনে বেরিয়ে এসে শব্দ লক্ষ্য করে সে এক ইয়া পাথর ছুঁড়ল। আর জমিদারের শাশুড়ী গাছ থেকে চিৎপটাং হয়ে পড়ে একেবারে গুঁড়িয়ে গেল।

জমিদার দেখল নিজের ইচ্ছায় ইয়ানিস কখনও যাবে না। ওকে তাড়াতে হবে এমন ভাবে যেন জমিদারের ক্ষতি না হয়। এই ভেবে সে তার বৌকে বলল, "ব্যাপার বড় খারাপ। তুমি ইয়ানিসকে বলবে আমার অসুখ করেছে। কোন কাজ নেই, সে যেন চলে যায়।"

জমিদার-বৌয়ের কথা শুনে ইয়ানিস বলল, "অসুখ করেছে তো করেছে। সেরে ওঠা অবধি আমি থাকব।"

তখন জমিদারের কথামত বৌ বলল, জমিদার মশাই মারাই গেছে।

—"মরেছে তো আর কি হবে। নতুন কাপড়চোপড় পরিয়ে, স্নান করিয়ে ওকে কবর দিতে হবে তো। তার পরই আমি যাব।"

ইয়ানিস জমিদারের দেহটা নিয়ে স্নান করাতে গেল। ঠাণ্ডা জলের বদলে ফুটন্ত জলে ফেলতেই জমিদার তড়াক করে খাড়া হয়ে উঠল।

ইয়ানিস বলল, "আরে বাঃ! কেমন বরাত! জমিদার বেঁচে গেছে।"

জমিদার মুখ বেঁকিয়ে বল্‌ল, "বরাত না ছাই। তোমার মাইনেপত্তর নিয়ে পালাও এখন। আর কখনও চাকর রাখছি নে বাবা! বেশ, শিক্ষা হল।"

ইয়ানিস চোখ রাঙ্গিয়ে বল্‌ল, "শুনুন, হুজুর। মা আমায় নরম প্রকৃতির করেছেন—না হলে আপনাকে আর বাঁচতে হত না আজ।"

সে চলে গেল।

মোরগের সাহস

ভিদ্‌জেম বলে এক শহরে এক গরীব লোক বাস করত। তার নিজের কোন থাকবার জায়গা ছিল না। জমিদার বাড়ির স্নানের ঘরে সে কোনরকমে রাত্রে শুত। বুঝতেই পারা যাচ্ছে কেমন করে সে ছিল। জমিদারের স্নান করবার ইচ্ছা হলে শীতই হোক আর গ্রীষ্মই হোক বেচারাকে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হত।

লোকটির একটা মোরগ ছিল। তাকে সে তার নিজের ছেলের মত ভালবাসত। জমিদার তাকে নানাভাবে উত্যক্ত করত, যা তা কাজে খাটিয়ে নিত, থাকবার জায়গা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত—শেষে একদিন তাকে মোরগ-সুদ্ধ তাড়িয়েই দিল। বেচারা শেষে মনের দুঃখে চোখের জল ফেলতে লাগল। কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবেই বা সে? মোরগটা রেগে গিয়ে বলল, "দুঃখ করবেন না। আমি জমিদার-বাড়ি যাচ্ছি। গিয়ে জমিদারের সঙ্গে কথা বলছি।"

পথে যেতে যেতে মোরগের দেখা হল একটা ভাল্লুকের সঙ্গে।

—"সুপ্রভাত, ভাল্লুককাকা!"

—"সুপ্রভাত, মোরগ-ভাইপো। চলেছ কোথায়?" বল্‌ল ভাল্লুক।

—"আর বল কেন। যাচ্ছি জমিদারীতে। আমার মালিককে জমিদার অপমান করেছে তাই।"

—"তাই নাকি। চল, আমিও যাই তোমার সঙ্গে।"

দুজনে যেতে যেতে দেখা নেকড়ের সঙ্গে।

—"সুপ্রভাত, নেকড়েমামা।" মোরগ বলে।

—"সুপ্রভাত, মোরগভাগ্নে। যাও কোথায়?"

—"আর বল কেন। যাচ্ছি জমিদারীতে! আমার মালিককে জমিদার অপমান করেছে তাই।"

—"তাই নাকি। চল দেখি, আমিও যাই।"

যেতে যেতে দেখা একটা বাজপাখির সঙ্গে।

—"সুপ্রভাত, বাজদাদা।" মোরগ বলল।

—"সুপ্রভাত, মোরগভাই। ব্যাপার কি? যাচ্ছ কোথায়?"

—"যাচ্ছি জমিদারের কাছে। আমার মনিবকে তাড়িয়ে দিয়েছে তাই।"

—"বটে, চল আমিও যাব।"

শেষে তারা জমিদারের বাড়ির কাছে এসে পৌঁছল। ভাল্লুককাকা, নেকড়েমামা আর বাজদাদা লুকল একটা ঝোপের আড়ালে আর মোরগ ছুটে গিয়ে জমিদারকে বল্‌ল, "কঁকঁর কো, কঁকঁর কো, জমিদার মশাই! আমার মনিবকে তাড়িয়েছেন। আমিও আপনাকে জমিদারী থেকে তাড়াব। কেন আপনি আমার মনিবকে অপমান করেছেন?"

জমিদারমশাই তখন আরাম করে বারান্দায় বসে কল্কি খাচ্ছিলেন। মোরগের ডাক শুনে বিরক্ত হয়ে চাকরদের বললেন মোরগটাকে ধরে হাঁসের খোয়াড়ে পুরে দিতে, ঠুকরে একেবারে শেষ করে দেবে। চাকররা মোরগটাকে ধরে হাঁসেদের মধ্যে ফেলে দিল। আর অমনি বাজপাখিটা উড়ে গিয়ে সব হাঁসগুলোকে মেরে ফেল্‌ল।

সকালবেলা মোরগ একটা গাছে উড়ে গিয়ে বস্‌ল। সেখান থেকে দরজায় গিয়ে বলতে শুরু করল, "কঁকঁর কো, কঁকঁর কো, জমিদারমশাই। আমার মনিবকে আপনি তাড়িয়েছেন। আমিও আপনাকে তাড়াব। অপমানের শোধ নেব।"

জমিদারমশাই বারান্দায় বসে বসে কফি খাচ্ছিলেন আগের মত। রেগে গিয়ে তিনি মোরগটাকে গোয়ালে ফেলে দিতে বললেন—গুঁতিয়ে শেষ করে দেবে একদম গরুগুলো।

চাকরগুলোও কথামত কাজ করল। তাই না দেখে নেকড়ে মামা বল্‌ল, "এবার আমার পালা।" সেও মোরগের পেছন পেছন গোয়ালে গিয়ে ঢুক্‌ল।

সকালবেলা চাকরগুলো গোয়ালে দিয়ে দেখল সব গরু মরে পড়ে আছে আর মোরগ দরজার উপর বসে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, "কঁকঁর কোঁ, কঁকঁর কোঁ, জমিদারমশাই। আপনি আমার মনিবকে তাড়িয়েছেন। আমিও আপনাকে জমিদারী-ছাড়া করব। অপমানের শোধ নেব।"

জমিদারমশাই কফির পেয়ালায় মুখ দিয়েছেন কি না এমন সময় শুনলেন মোরগের কথা। তিনি হুকুম দিলেন এবার মোরগটাকে ঘোড়ার আস্তাবলে ফেলে দিতে, পায়ে পিষেই মারা যাবে। চাকররা যে আস্তাবলে সব থেকে তেজী একগুঁয়ে ঘোড়াগুলো থাকে সেখানেই মোরগটাকে পুরে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভাল্লুককাকা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে মোরগের সঙ্গে যেতে যেতে বল্‌ল, "এবার আমার কেরামতি।"

সকালবেলা চাকরগুলো এসে দেখে সব ঘোড়া মেরে ফেলা হয়েছে আর মোরগটা দরজায় বসে বসে বলছে, "কঁকঁর কো,

কঁকঁর কোঁ, জমিদারমশাই! আমার মনিবকে আপনি তাড়িয়েছেন। আপনাকেও আমি তাড়াব তবে ছাড়ব। অপমানের শোধ নেব।"

জমিদারমশাই চাকরদের হাঁক পাড়তে পাড়তে ছুটে বেরিয়ে এলেন। আজ মোরগটাকে কুঁচি কুঁচি করে কেটেই ফেলবেন তিনি। এদিকে মোরগটা ভাল্লুককাকা, নেকড়ে-মামা, আর বাজদাদার সঙ্গে চেঁচাতে লাগ্‌ল। খুব একটা মারামারি হল। চাকরগুলো এতদূর পালিয়ে গেল যে আর বাড়ি ফেরবার পথই খুঁজে পেল না। মোরগটা জমিদারকে তার ডানার উপর বসিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি চাও তুমি?— মরবে না আমার শুয়োরগুলো দেখাশুনা করবে?"

জমিদার ভয়ে ভয়ে বল্‌ল, "ওঃ! মরার চেয়ে শুয়োর দেখাশুনা করাই ভাল।"

বাজপাখি বাসায় ফিরে গেল, নেকড়েটা মাঠে চলে গেল, ভাল্লুকটা বনে। আর মোরগটা তার মনিবকে জমিদারীতে নিয়ে এল। সুখে দিন কেটে যায় আর জমিদার শুয়োর দেখাশুনা করে আর চোখের জল ফেলে।

মেষপালকের তিন ছেলে

এক মেষপালক রাজার প্রাসাদে কাজ করত। তার ছিল তিন ছেলে। মেষপালকের ইচ্ছা ছিল তার ছেলেরা তারই মত সাধারণ মেষপালক হোক, কিন্তু ছেলেরা তা চাইত না। তারা দেশবিদেশ ঘুরে তাদের মনোমত পেশা জোগাড় করবে এই ঠিক করল। এই ভেবে তিন বছরের মধ্যে ফিরে আসবে কথা দিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল।

দূরেই থাক আর কাছেই থাক ছেলেদের কথা বাপমায়ের সবসময়ই মনে পড়ে। মেষপালক ভেড়া চরায়, বাড়ির কাজকর্ম করে, কিন্তু ছেলেদের কথা এতই ভাবে যে কখন কেমন করে তিন বছর কেটে গেল টেরই পেল না।

যখন সময় হল, কথামত ছেলেরা ফিরে এল। বড় ছেলে নিয়ে এসেছে একটা ছুঁচ, মেজ ছেলে একটা ধনুক আর ছোট এনেছে একটা লোহার ঘোড়া।

মেষপালক তো মহাখুশী। রাজাও তাঁর তিন মেয়েকে নিয়ে দেখতে এলেন তিন ছেলে কি নিয়ে এল।

রাজা প্রশ্ন করলে বড় ছেলে বলল, "আমি দরজির কাজ শিখেছি। যে কোন জিনিসই কেটে ছিঁড়ে গেলে আমি এমন ভাবে সারিয়ে দেব যে বোঝাই যাবে না।"

এই কথা শুনে রাজা একটা ডিম ছুঁড়ে মারলেন মেঝেতে। টুকরো টুকরো হয়ে ডিমটা ছড়িয়ে পড়ল। রাজা বললেন, "এটা সেলাই কর দেখি।"

কেমন করে বড় ছেলে ছুঁচ দিয়ে সেই টুকরোগুলো

জোড়া লাগিয়ে ডিমটা আস্ত করে দিল সেটা বল্লে মন্দুর নয়।

মেজছেলে বল্ল, "আমি খুব ভাল তীর ছুঁড়তে শিখে এসেছি। আমি যেখানে খুশী তীর ছুঁড়তে পারি আর লক্ষ্য আমার অব্যর্থ।"

—"চাঁদে পর্যন্ত ?" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।—

—"হ্যাঁ, চাঁদে পর্যন্ত।" এই বলে মেজো ভাই এক চোখ বুজে টিপ করে বলল, "চাঁদে দেখছি একটা সবুজ শরবন, সেখানে বসে রয়েছে একটা হাঁস—পালকগুলো তার সোনার। আমি ঐ পালকে মারছি তীর।" ছিলে ছেড়ে দিতেই সাঁ করে তীর বেরিয়ে গেল। দূরে আরও দূরে, আকাশ দিয়ে তীর বেরিয়ে গেল। চাঁদে ঝিক্‌মিক্ করে পালকগুলো খসে পড়ল।

রাজা বললেন, "আমরা তো আর হাঁসটা দেখতে পাচ্ছি না, কাজেই.........।"

তখন ছোট ছেলে বলল, "আমি এক কামারের কাছে শিক্ষালাভ করেছি। আমি লোহা পিটিয়ে সব কিছু বানাতে পারি। এই একটা ঘোড়া তৈরি করেছি। এই ঘোড়াটা স্থলে, জলে, শূন্যে সমান ছুটবে। আসুন, এটায় চড়ে সবাই চাঁদে যাই। তাহলেই মেজদার কথা প্রমাণিত হবে।"

রাজা তো ছোট্ট ছেলের মত আহ্লাদে আটখানা হয়ে ঘোড়ার পিঠে সকলের আগে লাফিয়ে উঠলেন, ভাবখানা বললেই হয়, "চল, এগিয়ে চল"। রাজকুমারীরা তারপর উঠল। দাদাদের আর মেষপালককে উঠিয়ে ছোটছেলেও চেপে বস্‌ল। ঘোড়ার কেশর একদিকে ঘুরিয়ে দিতেই

হাওয়া কেটে শূন্য দিয়ে ঘোড়া চলল চাঁদের দিকে। রাজা মুকুট পাকড়ে ধরলেন, রাজকুমারীরা কাপড়চোপড় সামলাতে লাগল আর মেষপালক দাড়িটা বাগিয়ে ধরল। চাঁদে পৌঁছল ঘোড়া। নীলনদীর পাশে সবুজ শরবনে সাদা হাঁস সবই রয়েছে—কেবল নেই সোনালী পালকগুলো—চাঁদের দমকা হাওয়ায় এখানে সেখানে উড়ে গেছে। রাজকন্যাদের হাঁসবেচারার জন্য বড়ই দুঃখ হল। এই দেখে বড় ভাই পালকগুলো জড় করে সেলাই করতে শুরু করল, আর খানিকক্ষণের মধ্যেই যেমন কে সেই ডানা হয়ে গেল।

আবার সকলে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। হাওয়ার মধ্য দিয়ে ছোট ছোট মেঘগুলো পায়ে করে হাটিয়ে দিয়ে ঘোড়া ফিরে চল্‌ল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তারা আবার পৃথিবীতে ফিরে এল।

রাজার মেয়েরা তাকাল তিন ভাইয়ের দিকে কেমন সুন্দর ওরা। তাদের ইচ্ছামতই রাজা তিন ভাইয়ের সঙ্গে তিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন। আর তাঁর রাজ্য তিন ভাগ করে তাঁর তিন বুদ্ধিমান জামাইকে রাজা করে দিলেন।

যে দেয় সে পায়

একটি গরীব লোক গীর্জায় যেয়ে শুনল বেদী থেকে পাদ্রীসাহেব বলছেন, "যে গীর্জেতে সর্বস্ব দান করে ভগবান তাকে দশগুণ ফিরিয়ে দেন, কারণ যে দেয় সে পায়।"

বোঝাই যাচ্ছে যে পাদ্রী তাঁর নিজের কথা বলছিলেন না, বলছিলেন ভগবানের কথা যা গীর্জের বড় বইয়ে লেখা আছে।

গরীব লোকটি ভাবতে ভাবতে বাড়ি এসে তার স্ত্রীকে বলল, "দেখ, গরুটা পাদ্রীসাহেবকে দিয়ে দেওয়া যাক। ভগবান দশগুণ তো ফিরিয়ে দেবেনই। আমাদের অভাবের সংসারে দশদশটা গরু হলে তবু কিছু সাচ্ছল্য হবে।"

তার স্ত্রী অনেক বারণ করল তাকে। সে বল্‌ল, "ভগবান যে দশটা গরু দেবেনই তার ঠিক কোথায়? পাদ্রীসাহেবের কথা বিশ্বাস না করলে কি হয় না? গরুটা না থাকলে ছেলেরা যে না খেয়ে মারা যাবে।"

কিন্তু দশটা গরু পেতে লোকটা এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে বৌ আর বিশেষ কিছুই বলল না। সকাল হতে না হতেই লোকটা গরু নিয়ে পাদ্রীর কাছে গিয়ে হাজির। আর পাদ্রীও গরুটা নিয়ে নিল। কোন কিছু নেবার সময় তার হাত সবসময়ই খোলা থাকে।

এ লোকটি বাড়ি ফিরে কবে গরু পাবে এই আশায় দিন গুনতে লাগল। ধৈর্য আর থাকে না।

একদিন পাদ্রীসাহেবের গরুগুলো মাঠে চরতে এসেছে। সঙ্গে গরীব লোকটির গরু আছে। সে তার পুরনো গোয়াল

দেখতে পেয়ে এক দৌড়ে ঢুকে পড়ল। আর তার পিছু পিছু দলের অন্য গরুগুলোও এই লোকটির বাড়ির মধ্যে চলে এল। সে তো আহ্লাদে আটখানা হয়ে গুনে দেখে দশটা গরু। ছুটে বাড়ির মধ্যে গিয়ে স্ত্রীকে বল্‌ল, "গিন্নী, গিন্নী! ভগবান আমাদের দানের জন্য দশটা গরু পাঠিয়েছেন এসে দেখ।"

স্ত্রী বলল, "ভগবান দিয়েছেন। দেখ এখন পাদ্রীসাহেব কি দেন!"

ওদিকে পাদ্রীসাহেবের রাখাল ইতিমধ্যেই এসে গেছে গরুগুলোকে তাড়িয়ে বার করতে।

গরীব লোকটি কিন্তু কিছুতেই আর গরুগুলো দেবে না। সে বলে, "পাদ্রীসাহেব তো বলেছেন যে গীর্জায় সর্বস্ব দান করে ভগবান তাকে দশগুণ ফেরত দেন। আমিও একটা গরু—আমার শেষ সম্পত্তি—দান করেছি, তার বদলে দশটা গরু পেয়েছি।"

চাকরটা দেখল এর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। সে খোদ পাদ্রী-সাহেবকেই ডেকে আনল। মুখ গোমড়া করে তিনি এলেন লাঠি হাতে। কিন্তু গরীব লোকটি সেই একই কথা বলল, "আমার কাছে যে গরুগুলো রয়েছে ওগুলো তো আপনার নয়। ভগবান ওগুলো পাঠিয়েছেন। আপনি তো বলেইছিলেন ভগবান দশগুণ ফেরত দেন দাতাকে।"

রাগে জ্বলে গিয়ে পাদ্রীসাহেব খুব লাঠি নেড়ে ওকে শাসালেন আদালতে যাবেন বলে। কিন্তু 'ভবী ভোলবার নয়'।

লোকটির স্ত্রী বলল, "তুমি বাপু আগেভাগে গিয়ে জজ-সাহেবকে কিছু দিয়েটিয়ে হাত কর।"

লোকটি পাদ্রীসাহেবের লাঠির কথা ভেবে দেখল তার স্ত্রী ঠিকই বলেছে। সে তাই ছেঁড়া জামাকাপড় গায়ে জড়িয়ে একটা ঝোলা কাঁধে চাপিয়ে জজসাহেবের কাছে রাতের জন্য আশ্রয় চাইল। জজসাহেব রাতের জন্য তাকে থাকতে দিলেন।

মাঝরাতে পাদ্রীসাহেব এসে জজসাহেবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে লাগলেন। জজও পাদ্রীর থেকে এক কাঠি বেশী। এই ফাঁকে কিছু টাকা রোজগার করা যাবে ভেবে খুব কথা-কাটাকাটির পর একটা মীমাংসা হল। গরীব লোকটি ভাবল দেখা যাক কি হয়।

সকালে আদালত বসলে সে আর পাদ্রী দুজনেই গেল। পাদ্রীসাহেব ওকে বললেন, "আমার গরু ফিরিয়ে দাও।"

"না দেব না। ঘুষ দিয়েছেন জজসাহেবকে। তবুও না। আপনি তো বলেছিলেন ভগবান দশগুণ ফেরত দেন দাতাকে?"

"হ্যাঁ, বলেছিলাম বটে। কিন্তু তুমি ভাল করে শুনতে পাওনি শেষ কথাগুলো গরীবের কাছ থেকে নিয়ে তিনি বড়-লোকদের ফেরত দেন।"

যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত গরুগুলো পাদ্রীসাহেবই পেলেন। তাঁর মত লোকের সঙ্গে কারো ঝগড়া করা কি চলে?

ঘোড়ার ডিম

এক জমিদার ছিলেন খুব ঘোড়ার ভক্ত। এমন ঘোড়া তাঁর থাকবে যা কারও নেই, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। কোথাও কোন মেলা হলেই তিনি সেখানে ছুটতেন, সে তাঁর স্ত্রী মৃত্যু-শয্যায় পড়ে থাকুন আর যাই হোক না কেন।

একদিন জমিদার মশাই ঘোড়ায় চড়ে অমনি এক মেলায় চলেছেন এমন সময় দেখা এক চাষার সঙ্গে—সে যাচ্ছে মেলায় এক ঝাঁকা শশা বিক্রি করতে। ঝাঁকাটা দেখে জমিদার মশাই শুধোলেন, "কি আছে গা তোমার ঝাকায়?"

লোকটি জমিদারের দিকে তাকিয়েই একনজরে বুঝে নিল, এ একেবারে বোকা, ভীষণ বোকা। সে বলল, "ডিম।"

—"ডিম? কিসের ডিম?" আশ্চর্য হয়ে জমিদার মশাই জিজ্ঞাসা করলেন।

—"এই ডিম থেকে ঘোড়ার ছানা হবে।"

এঁ্যা! ঘোড়ার বাচ্ছা! ডিম থেকে? তাজ্জব ব্যাপার! বোধহয় এমন ঘোড়া হবে কেউ কখনও দেখে নি। এতদিনে পেয়েছি। অদ্ভুত কিছু পেয়েছি। এই ভেবে জমিদার আনন্দে কাঁপতে কাঁপতে বললেন তাঁকে একটা ডিম বিক্রি করতে।

—"দাম বড় বেশী কিন্তু, হুজুর।"

—"কত, কত?"

—"একটা ডিম তিনশ টাকা।"

জমিদার অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু আজব ঘোড়া তাঁর চাইই, কাজেই তিনি টাকাটা দিয়ে দিলেন। এবার বাছতে

লাগলেন কোন্ ডিমটা নেবেন। সব থেকে বড় শশাটা বেশ করে জড়িয়ে নিয়ে তিনি বাগিয়ে ধরলেন।

তখন চাষাটি বলল, "হুজুর, ওটা একটা পাত্রে রাখতে হবে। আর আপনাকে নিজে ওর উপর বসে 'তা' দিতে হবে যতক্ষণ না ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। কেউ কেউ হয়তো আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে কি ব্যাপার, আপনি কেবল বলবেন, 'চিঁহিঁ, চিঁহিঁ'। নাহলে কিন্তু কিছুই বেরোবে না ডিম থেকে। সব কিছুরই একটা ধরনধারণ, কায়দাকানুন আছে তো, হুজুর।"

দুজনে ছাড়াছাড়ি হল। জমিদারের মেলায় যাওয়া মাথায় উঠল। বাড়ি ফিরেই তিনি ডিমে 'তা' দিতে বসলেন। তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন কেন এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলেন তিনি। কিন্তু উত্তর পেলেন কেবল—'চিঁহিঁ, চিঁহিঁ!'

তাঁর স্ত্রী তো মুখভার করে চলে গেলেন। বাধা তো আর দিতে পারেন না তিনি। না জানি মাথায় কি ভূত চেপেছে! চাকরবাকরদের হুকুম দেওয়া হল খাবারদাবার কর্তাকে দিয়ে আসতে, যেন কেউ তাঁকে বিরক্ত না করে।

সপ্তাহতিনেক জমিদার এমনি শশার উপর বসে থেকেও কিছুই বেরোল না। তখন তাঁর ভয়ানক রাগ হল। শশাটা নিয়ে তিনি হনহন করে চলে গেলেন বনে, তারপর যত জোর গায়ে ছিল ততজোরে একগাদা শুকনো পাতার উপর ফেলে দিলেন সেটা। একটা খরগোস ঐ পাতাগুলোর তলায় বসেছিল। ভীষণ ভয় পেয়ে, তড়াক করে বেরিয়ে পড়েই সে ছুট লাগাল। জমিদারের চোখ ফেটে জল এল, ডিমটা তো ফুটেছে তাহলে। ঘোড়ার বাচ্ছার মত গলা করে তিনি চেঁচাতে লাগলেন,

"চিঁহি, চিঁহি। কোথায় চললি রে গাধা? আয়, আয়। আমি যে তোর মা।"

কিন্তু খরগোসটা প্রাণপণে ছুটেছে। কি আর হবে? ভাগ্য খারাপ। মাথা নীচু করে জমিদার বাড়ি ফিরে এলেন এমন একটা ঘোড়া জন্মেছিল যা কেউ কখনও দেখে নি। নিজের হাতে সেটা তিনি ফেলে দিলেন। হায়, হায়! আর কি সেই চাষার দেখা মিলবে? বাড়ি ফিরে মনের ঝালটা তাঁর স্ত্রীর উপরই ঝাড়তে লাগলেন। অবশ্য তাঁর স্ত্রীর কোনই দোষ নেই, কিন্তু নিজের ভুল কি আর জমিদারমশাই স্বীকার করেন?

অতি লোভে

দুই ভাই। একজন গরীব, একজন বড়লোক। বড়লোক ভাই এত কিপ্‌টে আর লোভী যে লোকে তাকে বলত সর্বভুক। আর গরীব ভাইকে আর কি নাম দেবে—সব গরীবই তো সমান।

একদিন বড়ভাই সর্বভুক টেবিলের ধারে বসে বসে কি করা যায় ভাবছে এমন সময় সেই পথ দিয়ে ভাগ্যবুড়ি যাচ্ছিল। বুড়ি সর্বভুকের কাছে একটু ক্ষুদকুড়ো আর রাতের একটু থাকার জায়গা চাইল। সর্বভুক তার নোংরা, বিশ্রী পোশাকের দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "এখানে কি আমি অতিথি-শালা খুলেছি যে রাত্তিরে খেতে দেব আর থাকতে দেব? বেরোও, পাজী বুড়ি, নাহলে কুকুর লেলিয়ে দেব।" এই বলে সে ভাগ্যবুড়িকে তাড়িয়ে দিল।

ভাগ্যবুড়ি ঠুকঠুক করে গরীব ছোটভাইয়ের কুঁড়েতে গেল। ছোটভাই তাকে ভেতরে এনে টেবিলে বসিয়ে নিজের রুটির ভাগ দিল। খেয়েদেয়ে খড়ের গাদায় রাতে শুয়ে ভোরবেলা যাবার আগে ভাগ্যবুড়ি বলল, "বাছা সকালে তুমি যে কাজ আরম্ভ করবে সারাদিন সেই কাজই করবে।"

ছোটভাই তাঁত থেকে কাপড় খুলে আনতে গেল সকাল হতেই। টানে আর টানে—কি অবাক কাণ্ড! কাপড়ের আর শেষ নেই। টেনে টেনে, জড়িয়ে জড়িয়ে শেষে অন্ধকার হয়ে আসতে সে থামল। দেখে, সারা ঘর ঠাসা কাপড়ে।

পরের দিন হাটে গিয়ে সেই কাপড় বিক্রি করে এত টাকা সে উপায় করল যে গোনা যায় না। বাড়ি এসে সে ছেলেকে পাঠিয়ে দিল দাদার কাছ থেকে কুন্‌কেটা নিয়ে আসবার জন্য।

কুন্‌কে নিয়ে কি করবে? সর্বভুক ভাবতে ভাবতে নিজেই ছোট ভাইয়ের বাড়ি গেল কুন্‌কে হাতে। টাকার বোঝা দেখে তো তার চক্ষুস্থির। সে মেঝেতেই ঝপ করে বসে পড়ল। ছোট ভাই দাদাকে সব খুলে বলল।

সর্বভুক যেন দম আটকে আসছে এমনিভাবে বাড়ি ফিরল তাড়াতাড়ি। সারাদিন তার স্ত্রীকে দিয়ে এটাসেটা রাঁধাতে লাগল সে. আর নিজে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে চোখ ব্যথা করে ফেলল। আহা, আজও কি ভাগ্যবুড়ি যাবে না এই পথ দিয়ে?

ভাগ্যবুড়ি সন্ধ্যাবেলা সেদিনও ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সর্বভুক খাতির করে তাকে বাড়িতে এনে খুব খাইয়েদাইয়ে শেষে বিছানা পেতে শুতে দিল।

অন্ধকার থাকতেই বিছানা ছেড়ে সর্বভুক দাঁড়িয়ে আছে কখন ভাগ্যবুড়ি চলে যাবে। শেষকালে ভাগ্যবুড়ি এসে তাকে বলল, "আজ সকালে প্রথমে যা আরম্ভ করবে করতে, সারা-দিনই তাই করতে হবে।"

সর্বভুক ধন্যবাদ দেওয়া-টেওয়া ভুলে ছুটল গোলাবাড়িতে। স্ত্রীর সঙ্গে রাতে পরামর্শ করে সে ঠিক করেছিল সকাল থেকে তারা টাকা গুনবে। তার স্ত্রীও টাকার সিন্দুক খুলে তৈরি হয়েই ছিল।

হঠাৎ সর্বভুকের পিঠটা চুলকে উঠল। দরজার কাঠে পিঠটা

ঘরে কিন্তু আর সে ফিরে আসতে পারল না। লাথিই ছুঁড়ুক, নিজেকে গালাগালই দিক আর হাতই চালাক আর যাইই করুক না কেন, কিছুই হল না। সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে পিঠই চুলকে যেতে হল।

শেয়ালের শয়তানী

তোমরা বিশ্বাস কর আর নাই কর একদিন ভাল্লুক ঝাঁক্সিস, নেকড়ে ইটরিস আর শেয়াল আম্মা এই তিন বন্ধু ঠিক করল দুনিয়াটা ঘুরে দেখতে হবে। পথে খাবারদাবার চাই, তাই ভাল্লুক এক বাক্স মধু সঙ্গে নিল, নেকড়ে পিঠে চাপাল একটা ভেড়া। কিন্তু শেয়ালটা কিছু না নিয়েই বেরোল, ভাবল, "বাঃ বাঃ কে আর বয়ে নিয়ে যায়। পিঠ ভেঙ্গে যাবে। তার চেয়ে পথে কিছু চুরিটুরি করে জোগাড় করলেই হবে।"

ভাল্লুক আর নেকড়ে আশ্চর্য হয়ে তার দিকে চেয়ে বলল, "আম্মা ভাই, তুমি খাবার না নিয়েই যাবে ?"

—"আর ভাই, আমার শরীর খারাপ। খাবারে আমার অরুচি। নড়তেই পারছি না এত দুর্বল আমি।"

কি আর করা যায় ? সকলে এগিয়ে চলল সন্ধ্যা পর্যন্ত। রাতের মত থাকবার একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে তারা যে যার খাবার খুলে খেতে লাগল। নেকড়ে খেল ভেড়া, ভাল্লুক মধু কিছুটা খেয়ে পরের দিন সকালের জন্য বাকীটা রেখে দিল। কিন্তু শেয়াল বেচারা ক্ষিদেয় জ্বলতে লাগল, সবাই জানে তার বড় অসুখ। আসলে কিন্তু সে ক্ষিদের চোটেই মরমর।

নেকড়ে আর ভাল্লুক খেয়েদেয়ে ঘুমের চেষ্টা শুরু করে দিল। শেয়াল সবার আগে নাক ডাকালেও ঘুম তার একটুও পায়নি, সে ঘুমের ভান করছিল। যেই ভাল্লুক আর নেকড়ে

ঘুমিয়ে পড়েছে, অমনি সে মধুর বাক্স খুলে চোঁ চোঁ করে মধু খেতে লাগল। সব চাটিপুটি করে খেয়ে নিজের মধুমাখা থাবাটা বেশ করে নেকড়ের মুখে চুপিচুপি মাখিয়ে দিল। তারপর লম্বা ঘুম দিতে লাগল।

সকালে ঘুম ভেঙে উঠেই ভাল্লুক বাক্স খুলে দেখে কিছুই নেই। শেয়ালের ঘুম ভাঙিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "আমা, ভাই। তুমি কি আমার মধু খেয়েছ ?"

শেয়াল কোঁ কোঁ করে উত্তর দিল, "উঃ, আঃ। আমার তো অসুখ করেছে, রোগের জ্বালায় পড়ে আছি। তুমি কি বলছ ভাই আঁদ্রিস ? দেখছ না আমার অসুখ ? কেমন করে আমি মধু খাব ? ও নিশ্চয়ই ইউরিসের কাজ দেখছ না কেমন আরামসে ঘুমচ্ছে। ওর নাকেও তো মধু লেগে রয়েছে। কেমন করে তোমার মধু ওর নাকে গেল ?"

ভাল্লুক রাগে গরগর করতে করতে নেকড়ের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে চটাপট চড় মারতে মারতে বলল, "মধু খেতে সাধ তো নিজের মধু খেগে যা না ! নিজের মধু ! নিজের মধু !"

শেয়াল মনে মনে ভাবল, "ভাল্লুককে আর ভয় করি না। কিন্তু নেকড়েটাকে নিয়ে কি করি ? ঐ মার খাওয়ার পর ওর মাথায় কি ঢুকবে না যে আসল বদমাইস আমি ? তাহলেই সেরেছে। এইবেলা পালাই এখান থেকে।" এই বলে শেয়াল বনের দিকে দৌড় মারল।

নেকড়ে কোনরকমে ভাল্লুকের হাত থেকে ছাড়া পেল। বেড়াতে যাওয়া তখনকার মত মাথায় উঠল। ঠিক কিছু না বুঝেই সে আঁদ্রিসের কাছ থেকে পালিয়ে শেয়ালের পিছু পিছু ছুটল। শেয়াল দেখল ইউরিসের হাত থেকে সহজে ছাড়ান

পাওয়া যাবে না। সে থেমে গিয়ে বলল, "ভাই ইউরিস, আমি খাদের ধারে দাঁড়িয়ে আছি। তুমি আমায় ঠেলে ফেলে দাও, আমি কিচ্ছু বলব না।"

নেকড়ে তেড়ে গেল আর শেয়াল টুক করে সামনে থেকে সরে যেতেই সে হুড়মুড়িয়ে খাদে পড়ে গেল, আর উঠতে পারল না।

আর শেয়াল যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে ফিরে চলল পায়ের ছাপটা লেজ দিয়ে মুছতে মুছতে।

মিথ্যাবাদী শঠদের সঙ্গে থাকলে ঠকতেই হয়, ভাল কিছুই হয় না।

নেকড়ের ছাড়পত্র

সবাই বলে নেকড়ের নাকি একটা ছাড়পত্র ছিল যার জোরে সে যেখানে খুশী থাকতে পারত—মাঠে কি বনে, আবার গোয়ালঘরেও।

কিন্তু একদিন শরৎকালে ভীষণ বৃষ্টি পড়ে সেই অনুমতি-পত্রটা ভিজে যায়। নেকড়ে ভাবল কি করা যায়, কেমন করে ওটা শুকোবে? শেষে সে তার বন্ধু গৃহপালিত কুকুরের কাছে গিয়ে বলল, "ভাই কুকুর, আমার ছাড়পত্র নিয়ে তুমি শুকিয়ে দাও। একেবারে ভিজে গেছে।"

—"তা বেশ। না করবার আর কি আছে এতে?" এই বলে কুকুর ছাড়পত্রটা নিল তো, কিন্তু কোথায় কি করে ওটা শুকোবে সে ভেবেই পেল না। শেষে ঐ বাড়ির বেড়াল বন্ধুর কাছে সে গিয়ে বলল, "ভাই বেড়াল, নেকড়ের এই কাগজটা তুমি শুকিয়ে দাও না।"

—"বেশ তো। কেন দেব না।" বেড়াল কাগজটা নিল বটে কিন্তু সে অতি কুঁড়ে। সময় কোথায় তার এই ভেবে সে তার বন্ধু ইঁদুরকে বলল, "ছোট্ট ইঁদুরভায়া, নেকড়ের এই কাগজটা বেশ করে শুকিয়ে দাও না।" বন্ধুর কাজ করতে পেয়ে ইঁদুর খুব খুশি। সে ছাড়পত্রটা টেনে নিয়ে গিয়ে উনুনের ধারে রেখে দিল। কিছুক্ষণ পরে ইঁদুরের ইচ্ছা হল কাগজে কি আছে পড়ে দেখে। কিন্তু সে একদম বোকা, অক্ষর পরিচয়ই হয়নি। কাজেই পড়বার বদলে সে কাগজটা দাঁতে করে কাটতে লাগল। কাটতে কাটতে কিছুতেই

যখন তার মাথায় কিছু ঢুকল না তখন সে নিজের কাজে চলে গেল।

শীত পড়তেই নেকড়ের দরকার পড়ল কাগজটার। কুকুর-বন্ধুর কাছে এসে বলল, "ভাই, এবার আমার ছাড়পত্রটা ফেরত দাও। এতদিনে নিশ্চয়ই শুকিয়ে গেছে সেটা।"

সঙ্গে সঙ্গে কুকুর বেড়ালের কাছে গিয়ে সেই কাগজটা ফেরত চাইল।

বেড়ালও তখন ইঁদুরের কাছে গিয়ে বলল, "কই, আমার কাগজটা দাও।"

ইঁদুর দৌড়ে ছাড়পত্রটা নিয়ে এল। কিন্তু তখন কেবল ফুটো ফুটো ছেঁড়াছেঁড়া কাগজখানা রয়েছে। বেড়াল সেটা কুকুরের কাছে নিয়ে যেতেই কুকুর নেকড়েকে সেটা দিয়ে বলল, "এই নাও ভাই, তোমার ছাড়পত্র।" নেকড়ে বেচারা তার অনুমতিপত্রের ঐ দশা দেখে রাগে দিশেহারা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুকুরের ঘাড়ে। কুকুরও বেড়ালের উপর চটেমটে তাকেই তাড়া লাগাল। আর বেড়াল দৌড়ল ইঁদুরের পিছু পিছু। কিন্তু চালাক ইঁদুর বসে না থেকে সুড়ুৎ করে ঢুকে গেল একটা গর্তে।

সেই থেকে নেকড়েও আর খেতখামার বা গোয়ালঘরে যেতে পারে না—যাবার অনুমতিই নেই তো তার। বনেই থাকতে হয় তাকে। আর কুকুর দেখলেই সে তেড়ে যায়। কুকুরও বেড়াল দেখলেই ঝগড়া করে, চুলোচুলি করে। ইঁদুর বেচারা ছোট্ট। ঝগড়া তো সে করতে পারে না বেড়াল দেখলেই সে গর্তের মধ্যে সেঁধোয়।

এই ব্যাপারটা কিন্তু সত্যিই ঘটেছিল আমি জানি। উনুনের পাশে যে ঝিঁঝিঁ পোকাটার বাসা সেই আমাকে বলেছিল। বিশ্বাস না হয় তাকেই জিজ্ঞাসা কর।

অন্তর থেকে বল্‌লে পরে

এক জমিদার খামারে যাচ্ছিল চাষীপ্রজাদের মারধর করে খাজনা আদায় করতে। পথে দেখা হল তার শয়তানের সঙ্গে। দুজনে নমস্কার প্রতিনমস্কার করে পাইপ টানতে টানতে একসঙ্গে চলল গল্পগুজব করতে করতে।

হঠাৎ তাদের নজরে পড়ল একটি ছোট ছেলে শুয়োর চরাচ্ছে। একটা বড় শুয়োর হঠাৎ দল ছেড়ে আলুক্ষেতে ঢুকে পড়ল। ছেলেটা জমিদারকে দেখতে পেয়ে শুয়োরটার কাছে ছুটে গিয়ে ওটাকে তাড়িয়ে আনতে চেষ্টা করল। কিন্তু শুয়োরটা আলুর গাছের উপর এধার ওধার ছুটে সব তছনছ করে দিল। ছেলেটা চীৎকার করে বলতে লাগল, "পাজী, বদমাস কোথাকার! শয়তানে নেয় না কেন তোকে?"

এই কথা শুনে জমিদার শয়তানকে বলল, "শুনছ, বন্ধু? তোমায় ছোঁড়া শুয়োরটা উৎসর্গ করছে। নিয়ে নাও তবে। আমি হলে নিশ্চয় নিতুম।"

শয়তান উত্তর দিল, "হুঁ আমাকেই দিচ্ছে বটে। ঐ ছেলেটার বাপ মা কেউ নেই। শুয়োরটা নিয়ে নিলে ওর মনিব ওকে কয়েদ করে রাখবে—বাঁচাবার কেউই নেই ওকে। তাই মনে হচ্ছে ওকথা ও এমনিই বলেছে, সত্যিসত্যি বলে নি।"

—"যেমন তুমি বোঝ," বলল জমিদার। আর একটু দূরে যেয়ে তারা শুনল একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদছে—অঝোরে কাঁদছে। তার মা তখন ধান বুনছে—ছেলের আবদার শোনার

সময় নেই। ছোট ছেলেও তাই কেঁদেই চলেছে। মায়ের খুব ভুখ হলেও খেতে সে পারছে না। সূর্য ডুবতে চলল অথচ তখনও কাজ শেষ হয় নি। বিরক্ত হয়ে মা ছেলেকে বলল, "শয়তানে ধরুক না তোকে। সব ধান পড়ে যাচ্ছে। তোর বাবাকে যেতে হবে জমিদারের কাছে আর তুই খালি আমার কাজের সময় বিরক্ত করছিস।"

জমিদার এই কথা শুনে শয়তানকে এক খোঁচা দিয়ে বলল, "শুনলে তো বন্ধু। ও তোমাকে ছেলেটা দিতে চায়। নিচ্ছ না যে বড়? আমি হলে নিতুম।"

—"সত্যি বটে। কিন্তু ঐ মায়ের ঐ একমাত্র ছেলে। ওকে কেড়ে নিলে কে আর রইল তার? আর তাছাড়া ঐ কথাগুলো সে মন থেকে বলেও নি। আসলে সে ছেলের উপর চটে নি, রেগেছে তোমাদের উপরই।"

—"তুমিই জান বাপু।" জমিদার মুখ গোঁজ করে বলে।

আরও কিছুদূর যেয়ে তারা দেখতে পেল চাষারা জমিদারের ক্ষেতের উপর ঝুঁকে পড়ে কাজ করছে। হাতের লাঠিটা শক্ত করে বাগিয়ে ধরল জমিদারমশাই। সন্ধ্যার আগেই সব বীজ তুলতে হবে, ওদিকে মাঠের আধখানাই এখনো বাকী। জমিদার ভাবল, "আচ্ছা, দেখাচ্ছি এখনই। পিঠের চামড়া ছুলে নেব একেবারে।"

চাষীরা জমিদারকে দেখেই তাকে গালাগাল দিতে লাগল, "ওঃ! শয়তানে ধরে না কেন ঐ পাজীটাকে? আবার হতভাগা এসেছে কাকে মারতে!"

শয়তান এবার জমিদারকে কনুইয়ের খোঁচা মেরে জিজ্ঞাসা করল, "কি ভাই, শুনছ কি বলছে ওরা?"

—"হু, কিন্তু কে ওদের কথা শুনছে ? কুত্তার মত মা
না দিলে ওরা আমাকে পথে বসাবে তা জান ? ওরা আবা
মানুষ যে ওদের কথা শুনতে হবে ?"

শয়তান বলল, "মানুষ কিনা জানি না। কিন্তু কথাগুলে
ওরা অন্তর থেকেই বলেছে। তোমাকে আমি ধরবই কাে
কাজে।"

এই বলেই শয়তান জমিদারকে দড়ি-পাকানোর মত কে
করে ধরে ঝোলায় পুরে সটান নরকে ফিরে গেল।

শেয়ালের পরোপকার

এক চাষী শহরে যাবার পথে একেবারে হঠাৎ পড়ে গেল এক ভাল্লুকের মুখোমুখি। বসন্তকাল সবে—এ সময় ভাল্লুকেরা খুবই ক্ষুধার্ত থাকে। কাজেই এই ভাল্লুকটা বলল, "চাষাভাই। আমি তোমায় খাব।"

—"না, না, ভাল্লুকমশাই। আমায় খাবেন না। আমি আপনার জন্য একটা শুয়োর আনব।"

—"বেশ, বেশ। তবে কাল সকালেই আমার শুয়োরটা চাই।"

পরেরদিন সকালবেলাই শুয়োর নিয়ে চাষী চলেছে ভাল্লুকের কাছে। চোখের জল আর সামলাতে পারছে না সে। ঐ শুয়োরটাই তার শেষ সম্বল। কিন্তু কি আর করবে সে? তার প্রাণের দাম তো শুয়োরটার চেয়ে বেশী। পথে দেখা একটা শেয়ালের সঙ্গে। চাষীর মুখভার দেখে শেয়াল শুধোল, "চাষী ভাই, কি নিয়ে যাচ্ছ? তোমার মুখই বা শুকনো দেখছি কেন?"

চাষী তার দুর্ভাগ্যের কথা সব খুলে বলল। শেয়াল সব শুনে বলল, "তুমি তো আচ্ছা বোকা। শুধু শুধু অমন একটা শুয়োর ভাল্লুকটাকে দিয়ে দেবে? শোন, আমায় যদি একটা মোরগ আর একটা মুরগীর ছানা দাও তবে তোমায় এমন শিখিয়ে পড়িয়ে দেব যে ভাল্লুক আর কিছুতেই শুয়োরটা নিতে পারবে না। যখন ভাল্লুক আসবে তখন তুমি আমাকে ডাকবে 'জজ সাহেব' বলে, আর আমি যখন তোমায় জিজ্ঞাসা করব

শেয়ালের বোকামী

বনের মাঝ দিয়ে শেয়ালটা ছুটছে ক্ষিদের জ্বালায়, পথে সে দেখে একটা পাখি একটা মাছির পিছু পিছু উড়ছে। একটা ছোট্ট ফার গাছে তার বাসা, বাসায় হাঁ করে তার বাচ্চাগুলো বসে রয়েছে। শেয়াল গাছটার কাছে গিয়ে চেঁচাতে লাগল, "এদিকে আমার লাঙলটাই ঠিক হয়নি এখনও। এই ফার গাছটা কেটে ফেলতে হবে। এতে বেশ সুন্দর লাঙলের হাতল হবে।"

পাখিটা এই কথা শুনে শেয়ালকে অনুনয় করে বলল, "কেটো না শেয়ালদাদা, এই গাছটা কেটো না। ছেলেগুলো তাহলে সব মারা পড়বে।"

শেয়াল গম্ভীর মুখে বলল, "তবে তোর একটা ছানা আমায় দে। তাহলে ছেড়ে দিতে পারি।" পাখিটা হাপুসনয়নে কাঁদতে লাগল। ছেলেকে ছেড়ে সে থাকবে কি করে?

কাকেদের ঠাকুমা পাখির কান্না শুনে বলল, "কেঁদো না, বাছা। শেয়াল গাছ কাটুক না দেখি। কুড়ুল কোথায় পাবে।"

শেয়াল ভয় দেখাবার জন্য লেজ দিয়ে জোর জোর গাছটা নাড়াতে লাগল। পাখি দেখল তাইতো! এর কুড়ুল তো তেমন ধারাল নয়। সে ভেবেছিল ঐ লেজটাই বুঝি শেয়ালের কুড়ুল। নিশ্চিন্ত হয়ে সে বাচ্চাদের খাবার জন্য মাছি ধরতে বেরিয়ে গেল।

শেয়াল কাকঠাকুমার উপর চটেই আগুন। "দেখাচি

মজা," এই বলে সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে, কাতরাতে কাতরাতে হোঁচট খেতে খেতে বলতে লাগল কেঁদে কেঁদে, "বাবারে মারে! খিদের জ্বালায় মরলুম। এখনই মরলুম বুঝি।"

এই বলে সে সত্যিই ধড়াস করে পড়ে গিয়ে লেজ বিছিয়ে পা ছড়িয়ে মড়ার মত পড়ে রইল। কাক দেখে আর দেখে—সত্যিই শেয়াল একদম নড়ছেও না, চড়ছেও না, মরেই গেল তাহলে বোধ হয়। উঁহু, পরীক্ষা করে তো দেখতে হবে।

উড়ে গিয়ে কাক বসল শেয়ালের মাথায়। অমনি খপ করে শেয়াল কাককে ধরে বলল, "এইবার তোমার মরণ ঘনিয়ে এসেছে।"

কাক বলল, "মরণ আসুক, পরোয়া করি না। তবে তোমার ঠাকুমা আমার ঠাকুর্দাকে যেমন যন্ত্রণা দিয়েছিল তেমনি না করলেই বাঁচি।"

শেয়াল হাঁ হয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন করে আমার ঠাকুমা তোমার ঠাকুর্দাকে কষ্ট দিয়েছিল ?"

—"শোন তবে। একটা চাকার মাঝে ঠাকুর্দাকে পুরে সেই চাকাটা গড়িয়ে ফেলে দিয়েছিল পাহাড়ের চুড়ো থেকে। কি ভয়ঙ্কর বল তো!"

শেয়ালও নেচে উঠল। একটা চাকা জোগাড় করে তার মাঝে কাককে পুরে একটা ছোট পাহাড়ের উপর থেকে চাকাটা সে ফেলে দিল। কিন্তু কাকটা উড়ে গেল ফুড়ুক করে আর শেয়াল ফ্যালফ্যাল করে বোকার মত চেয়ে রইল।

দুর্ভাগ্য বুড়ির কাণ্ড

অনেক অনেক দিন আগে দুই ভাই বাস করত। ছোট ভাই ছিল গরীব আর বড় ছিল বড়লোক। এমন দিন নেই যে বড়ভাইয়ের বাড়ি অতিথি না আসত। কিন্তু ছোটভাইয়ের বাড়িতে ছেলেগুলোই খেতে পেত না। বড়ভাইয়ের খাবার সময় অনেক লোকই নিমন্ত্রিত হত, কিন্তু ছোট ভাইয়ের ঠাঁই ছিল না সেখানে।

ছোট ভাই তার কনকনে ঠাণ্ডা কুঁড়েতে বৌ ছেলে নিয়ে বসে ছিল। এত খিদে পেয়েছে তাদের যে কাঁদবার ক্ষমতাও যেন নেই।

ছোট ভাই ভাবছিল, "এমন দুর্ভাগ্য কেন আমার? খেটে খেটে আমাদের হাতপা খসে যাচ্ছে তাও আমাদের টাকা নেই। এমনিভাবেই মরতে হবে আমাদের। ওদিকে দাদার বাড়িতে কত লোকই না আসছে, যাচ্ছে, খেতে পাচ্ছে। বাজনা বাজছে, গান হচ্ছে।"

তার বৌ বলল, "একবার দাদার কাছে যাও না গো। ছেলেদের জন্য এক টুকরো রুটি নিশ্চয়ই পাবে।"

ছোট ভাই আস্তে আস্তে বড় ভাইয়ের বাড়ি গেল। একটা কোণে বসে থাকতে থাকতে ভাল ভাল খাবারের গন্ধে তার জিভে জল আসতে লাগল। কিন্তু কেউই তাকে অভ্যর্থনা করল না, আদর যত্ন করল না, কি খেতেও বলল না। চুপ করে সে মাঝরাত অবধি বসেই রইল। একে একে অতিথিরা যে যার বাড়ি চলে যাচ্ছে। বিদায় দেবার

সময় বড়ভাই সবাইকে খাবারদাবার দিয়ে দিচ্ছে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য। শেষে ছোট ভাই উঠে আস্তে আস্তে দরজার কাছে গেল।

বড়ভাই তাকে থামিয়ে বলল, "একি, খালি হাতে বাড়ি যাচ্ছিস কেন? এইটা নিয়ে যা।" এই বলে সে একটা আধচোষা হাড়ের টুকরো ছোট ভাইকে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

ছোট ভাই চোখের জলে ভাসতে ভাসতে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বাড়ির দিকে চলল। হঠাৎ সে শুনতে পেল তার পিছু পিছু কে আসছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। পিছন ফিরে সে দেখে একটা বিশ্রী দেখতে বুড়ি তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে।

ছোট ভাই জিজ্ঞাসা করতে যাবে কেন বুড়ি তাকে এমন করে নকল করছে, এমন সময় বুড়ি তার হাতের হাড়টাতে টান মেরে বলল, "এই হাড়টা আমায় দাও। এত চর্বিওলা হাড় তুমি কি করবে?"

ছোট ভাই হাড়টা বুড়িকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কে তুমি?"

হাড়টা আরাম করে চুষতে চুষতে বুড়ি বলল, "তোমার দুর্ভাগ্য"। লোভে তার সব শরীর কাঁপছে। চুষতে চুষতে শরীরটা ছোট করে সে শেষে হাড়ের নলীটার মধ্যেই ঢুকে গেল। ছোট ভাই এই দেখে তাড়াতাড়ি তার লাঠির ডগাটা একটু ভেঙ্গে হাড়ের ফুটো দুটো বন্ধ করে দিল। তারপর এক ছুটে একটা জলার ধারে গিয়ে হাড়টা ছুঁড়ে কাদার মধ্যে ফেলে দিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

দিন দিন ছোট ভাইয়ের অবস্থা ফিরে যেতে লাগল। অবশেষে ভোজ দেবার মত ক্ষমতাও তার হল। বড় ভাইকেও সে ডেকে আনল—পাজী হলে কি হবে নিজের ভাই তো। বড় ভাই ভাবল শেষে ছোটভাই না কিছু চেয়ে বসে।

ছোট ভাই আর তার বৌ বড়ভাইকে আদর করে ডেকে এনে বসাল। বড় ভাই দেখে ছোট ভাইয়ের কত দামী দামী জিনিসপত্র আর হিংসায় জ্বলে মরে।

তিনদিন ধরে খাওয়াদাওয়া, আমোদ-আহ্লাদ চলল। শেষে বড় ভাই প্রশ্ন করল, "টাকা কোথা থেকে পেলি রে? আগে তো রুটিও জুটত না তোর।"

ছোটভাই কিছু না লুকিয়ে কেমন করে সে হাড়টা নিয়ে যাচ্ছিল, কেমন করে তার দুর্ভাগ্য বুড়ি এসে হাড় খেতে খেতে ভেতরে ঢুকল আর শেষে কি হল সবই খুলে বলল। শেষে সে বলল, "দাদা, তোমার দয়ায়ই এমন হল।"

ছোটভাই সরল প্রাণে সব কিছু বললেও বড়ভাই মনে মনে হিংসায় পুড়ছিল। মনে মনে তার হচ্ছে কেমন করে ছোট ভাইয়ের সর্বনাশ করবে তারই চিন্তা।

বড় ভাই বাড়ি ফিরে গিয়েই সামান্য কাপড়চোপড় পরে ছুটে এল জলার ধারে। তারপর নেবে পড়ল কাদার মধ্যে। তিনদিন ধরে খোঁজাখুঁজির পর শেষে সেই হাড়টা পেল। দুর্ভাগ্যবুড়িকে ছেড়ে দিয়ে সে মনে মনে বলল, "এবার কি হয়? তোমার ভোজের এই দাম দিলুম। এবার বোঝ ঠেলা।"

হাড়ের মধ্যে থেকে দুর্ভাগ্য বুড়ি বেরিয়ে আসে। সোজ হয়ে দাঁড়াতেই পারছে না সে। ক্রমে ক্রমে হাত প

ছাড়িয়ে জোরে দম নিয়ে সে বলল, "তোমায় শতশত ধন্যবাদ। একবছর এমনিভাবে আটক আছি। আর কিছু-দিন হলে শেষই হয়ে যেতুম। তুমি খুব ভাল লোক। এখন থেকে আমি সবসময় তোমার কাছেই থাকব।"

ভয় পেয়ে বড়ভাই বলে উঠ্‌ল, "আমার ভাইয়ের কাছে যাও, আমার ভাইয়ের কাছে যাও। ওর কাছে যাবার জন্যই তো তোমায় ছেড়ে দিলুম।"

আঁতকে উঠে বুড়ি বলল, "না, না। তোমার ভাই আর একটু হলেই আমার দফা নিকেশ করে দিয়েছিল। ওর কাছে আর যাচ্ছি না বাবা। তুমি আমায় রক্ষা করেছ। তোমার কাছেই আমি থাকব।"

বড়ভাই বুড়িকে আবার হাড়ের মধ্যে গুঁজে দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু ধরাই যায় না পাজী বুড়িকে। হাঁফিয়ে গিয়ে শেষে সে হাল ছেড়ে দিল। বাড়ি ফিরে গিয়ে সে দেখে বুড়িও আসছে পিছু পিছু।

বাড়ি এল সে—কিন্তু বাড়ি কোথায়? আগুনে পুড়ে সব ছাই হয়ে গেছে। কার দোষ কে জানে?—বুড়ির না বড় ভাইয়ের?

এখন থেকে বড় ভাইয়ের খালি ক্ষতিই হয়। ভোজের কথা ছেড়ে দিলুম, কাপড় কেনবার টাকাই নেই তার। পরের জন্য গর্ত খুঁড়লে নিজেকেই গর্তে পড়তে হয়।

এক যে ছিল বুড়ো সৈন্য

ব্রেণ্টসিস নামে এক সৈন্য জারের অধীনে প্রায় পঁচিশ বছর চাকরি করার পর যখন খুব বুড়ো হয়ে গেল তখন তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল। যাবার সময় তাকে দেওয়া হল কেবল একটা আধপোড়া লাল রুটি আর তিন আনা মাত্র। ব্রেণ্টসিস পয়সা ক'টা পকেটে পুরে কাঁধের উপর ঝোলাটা চড়িয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল। কোথায়? তাকে বলা হয়েছিল বাড়ি ফিরে যেতে। কিন্তু কর্তাদের মাথায় ঢোকে নি যে তার আত্মীয়স্বজন অনেক আগেই মারা গেছে আর তার বাড়িও কবে ধ্বসে গেছে।

যাই হোক ব্রেণ্টসিস তো চলেছে—এক! দুই! তিন! এক! দুই! তিন!

যেতে যেতে পথে দেখা একটা ছেলের সঙ্গে। ভাল খেতে পরতে পেলে ছোকরার চেহারাটা ভালই লাগত। সে কিছু ভিক্ষা চাইল ব্রেণ্টসিসের কাছে।

"তাই তো, দাদু। আচ্ছা, আমার মাইনেটা তোমার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যাক।" এই বলে ব্রেণ্টসিস তাকে রুটির খানিকটা আর এক আনা দিয়ে আবার পথ চলতে লাগল। এক! দুই! তিন! এবার দেখা হল এক বুড়ির সঙ্গে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঠকঠক করে কাঁপছে বুড়ি সেও কিছু ভিক্ষা চাইল।

ব্রেণ্টসিস বলল, "আচ্ছা বোন, এই নাও।" বলে তাকে খানিকটা রুটি আর এক আনা দিয়ে সে আরও এগিয়ে

চলল, এক! দুই! তিন! এবার তার কাছে ভিক্ষা চাইল এক আদ্যিকালের বুড়ো—বয়সের চাপে সে কুঁজো হয়ে গেছে, চামড়া কুঁচকে গেছে।

ব্রেণ্টসিস বলল, "বাবা, তুমি আর পয়সা নিয়ে কি করবে? আচ্ছা, তোমাকে আমার শেষ সম্বল দিয়ে দিচ্ছি।" ব্রেণ্টসিস বুড়োকে আনিটা আর রুটির বাকী ভাগটা থলিশুদ্ধ দিয়ে বলল, "এবার আমিও ভিখারী। বোঝাই যাচ্ছে জারের রাজত্বে ও জিনিসটার অভাব নেই। আর আমার দেবারও কিছু নেই, মনও তাই সাদা।"

কিন্তু বুড়ো তাকে বলল, "তাই তো। তোমার কিছুই রইল না, বাবা। এটা ঠিক নয়। তুমি আমার ঝোলাটা রেখে দাও। অনেক দরকারে লাগবে।"

ব্রেণ্টসিস বুড়োর কথা ঠেলতে না পেরে ঝোলাটা নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে দিল। যেতে যেতে তার ভীষণ পাইপ টানতে ইচ্ছা হল। কিন্তু তামাক আর কোথায়? দুর্ভাগ্য এমনই। সে শুধু পাইপটাই চুষতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল, "দেখি, একবার বুড়োর ঝোলাটা খুঁজে। একটা খড়কুটোও কি পাব না? খড়টাই না হয় তামাকের কাজ চালাবে।" আবার সে ভাবল, "আহা, যদি পোয়াখানেক তামাক পাওয়া যেত ঝোলাটায়।"

সঙ্গে সঙ্গে ঝোলাটা যেন নড়ে উঠল। ব্রেণ্টসিস ঝোলা খুলে দেখে, ওমা! এক পোয়া তামাক রয়েছে। তামাকটা যে কি ভাল সে কথা আর কি বলব। ব্রেণ্টসিসের উপরওয়ালা প্রধান সেনাপতিও বোধ হয় এমন তামাক কখনও দেখেনি। পাইপ খেতে খেতে সে ভাবতে লাগল, "আহা,

তামাকই যদি মিলল, তবে আর এক টুকরো রুটিও কি আর পাব না।

যেই না ভাবা অমনি থলিটা নড়ে উঠল। ব্রেণ্টসিস খুলে দেখে একটা সাদা রুটি। তখন সে বুঝতে পারল এক টুকরো রুটি আর এক আনার বদলে বুড়ো তাকে কেমন থলিই না দিয়েছে। খাবার ভাবনা আর তার রইল না। আনন্দে শিস দিতে দিতে সে পা চালাল।

হঠাৎ ঝমাঝম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ব্রেণ্টসিস একেবারে ভিজে গেল। একটা সরাইখানায় কোনরকমে পৌঁছে সে কড়া নাড়তে লাগল। কিন্তু সরাইওয়ালা কিছুতেই তাকে ঢুকতে দেবে না। সরাইখানায় একতিলও জায়গা নেই। সরাইওয়ালা ব্রেণ্টসিসকে রাস্তার উল্টোদিকে একটা ভাঙ্গা দুর্গে রাত কাটাতে বলল। অবশ্য ঐখানে রাতে শয়তানের বাচ্ছাগুলো মাঝে মাঝে বেয়াদপি করে তবে সরাইওয়ালার তাতে কি।

খোলা রাস্তায় থেকে ঠাণ্ডায় জমে যাবার ইচ্ছা ব্রেণ্টসিসের মোটেই ছিল না। তার চেয়ে বরং ঐ ভুতুড়ে দুর্গে যাওয়াই ভাল। যা হয় হোক। ব্রেণ্টসিস দুর্গে ঢুকে একটা ঘরে আগুন জ্বেলে পেটভরে খেয়ে তামাক ধরিয়ে আয়েস করে ঘুমের চেষ্টা করতে লাগল।

চোখ বুজে সবে সে ঘুমিয়েছে আর ঝনঝন করে একটা শব্দ হল, কি একটা ধপাস করে পড়ল, সার্সিগুলো কেঁপে উঠল আর দরজাগুলো দড়াম্ দড়াম্ করে খুলতে এবং বন্ধ হতে লাগল। একটা ছ'মুখো ভূত এসে ব্রেণ্টসিসকে চোখ রাঙিয়ে বলল, "এই শুনছিস! কার হুকুমে তুই আগুন

জ্বেলেছিস ?" ব্রেণ্টসিস রেগেমেগে বলল, "আঃ, জ্বালালে দেখছি। চেঁচাচ্ছিস কেন ? দাঁড়া, ঢোক আমার থলিতে।"

মুহূর্তের মধ্যে ভূতটা ব্রেণ্টসিসের থলের মধ্যে এসে গেল। আর যায় কোথা ? উনুন খোঁচাবার লোহার ডাণ্ডাটা নিয়ে ব্রেণ্টসিস দমাদ্দম বাড়ি লাগাতে লাগল। ছুঁমুখো ভূতটা যন্ত্রণায় ছটফট করে আর চেঁচায়। সেবারকার মত সে মাপ চাইতে লাগল, বিনিময়ে ব্রেণ্টসিস যা চাইবে তাই সে দেবে। ব্রেণ্টসিস ডাণ্ডাটা রেখে তাকে থলি থেকে বার করে দিল। এক সিন্দুক রূপোর টাকা আনতে বলল ব্রেণ্টসিস তাকে— আরও বলল সে যেন আর কখনো পৃথিবীতে না আসে। ভূত তাতেই রাজী। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে এক সিন্দুক টাকা রেখে বেচারা এত জোরে নরকে পালাল যে চারধার কেঁপে উঠল।

সকালবেলাই সরাইওয়ালা দেখতে এসেছে ভূতেরা কি করেছে ব্রেণ্টসিসকে। এসে দেখে সে দিব্যি সুস্থশরীরে খাবার খাচ্ছে আর পাইপ টানছে। কি আশ্চর্য ! সরাই-ওয়ালা হন্তদন্ত হয়ে ছুটল বাড়ির মালিকের কাছে। সবকথা শুনে মালিকও ছুটে এল ব্রেণ্টসিসের কাছে জিজ্ঞাসা করতে, সত্যিই সে রাতে দুর্গে ছিল কি না ?

ব্রেণ্টসিস বল্‌ল, "হ্যাঁ, ছিলামই তো।"

—"ভয় করে নি ?"

—"না, ভয় কিসের ? আমাদের সেনাপতি ঐ ভূতগুলোর চাইতেও খারাপ, আবার ক্যাপটেন সেনাপতিরও এক-কাঠি উপরে, লেফটেন্যাণ্ট তো আরও পাজী, সবচেয়ে বদমাস্ সার্জেণ্ট। তার তুলনায় ভূত তো শিশু।"

—"তাই নাকি? তা ব্রেণ্টসিস, তুমি আর কদিন দুর্গে থেকে ভূতগুলোকে তাড়িয়ে দাও না ভাই।"

ব্রেণ্টসিস রাজী হল। পরের দিন রাতে সে আগু জ্বেলে, খেয়ে-দেয়ে তামাক খেতে লাগল।

মাঝরাতে আবার সেই ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ, দরজার দড়াম দড়াম শব্দ, আর সার্সির ঠকাস্‌ ঠকাস্‌ ধাক্কাধাক্কি। একট ন'মাথাওয়ালা ভূত ব্রেণ্টসিসের কাছে এসে গজরাতে গজরাতে বলল, "এই, হতভাগা! আগুন জ্বেলেছিস কার হুকুমে?"

—"আচ্ছা ফাজিল তো! আওয়াজ করছিস কেন? আ আমার ঝোলাতে।" বলতে না বলতে ভূতটা ঝোলার মধে ঢুকে পড়ল সুড়ুৎ করে। ব্রেণ্টসিসও গায়ের জোরে আগে দিনের মত খুব পিটুনি দিতে লাগল।

—"বাপরে, মারে, যা চাও তাই দেব রে", বলে ভূত তে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। ব্রেণ্টসিস তাকে ছেড়ে দিয়ে হুকুম করল এক সিন্ধুক মোহর নিয়ে আসতে, তারপর পৃথিবী ছেড়ে পালাতে। এক দৌড়ে সিন্ধুক এনে ভূত চোখকা বুজে নরকে পালাল—কেবল একটা ধোঁয়া দেখা গেল।

তৃতীয় দিন রাতেও ব্রেণ্টসিস আগুন জ্বেলে খাওয়া-দাওয় সেরে পাইপ টানছে। মাঝ রাত পার হয়ে গেছে। এমন সময় ভীষণ শব্দে ব্রেণ্টসিস-সুদ্ধ ভয় পেয়ে গেল। জানালা-গুলো খুলে গেল, দরজা খসে পড়ল, চিমনীগুলো থরথর করে কাঁপতে লাগল। একটা বারমাথাওয়ালা ভূত এসে সৈন্যদলের সার্জেন্টের মত বলল, "এই উল্লুক! আগুন জ্বেলেছিস কেন?"

ব্রেণ্টসিসও গলার জোরে হাঁকল, "চেঁচাচ্ছিস কেন? আয় আমার ঝোলার মধ্যে।"

আর যায় কোথা? বারমাথাওয়ালা ভূত একেবারে জল-ছেলের মত ঢুকে পড়ল ঝোলার মধ্যে। আর ব্রেন্টসিসও বেদম মার দিতে লাগল তাকে। শেষে ঘিনঘিন করে ভূত বলে, "ছেড়ে দাও, যা চাও তাই দেব।"

ব্রেন্টসিস তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, "যা। এই পুরনো ভাঙ্গা দুর্গের জায়গায় একটা নতুন দুর্গ তৈরি করে দে এখনই। তারপর পালাবি এখান থেকে সোজা নরকে।"

সঙ্গে সঙ্গে হুড়ুম দুড়ুম আওয়াজ করে ভূতটা নতুন দুর্গ তৈরি শুরু করে দিল। বাড়ির মালিক বিছানায় শুয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল কি হচ্ছে ভেবে। সকাল হবার আগেই দুর্গ তৈরি। কপালের ঘাম না মুছেই বারমাথাওয়ালা ভূত উধাও হয়ে গেছে নরকে।

সকালে মালিক ভয়ে ভয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে ওমা! পাহাড়ের উপর একটা নতুন দুর্গ। ছাতে বসে বসে ব্রেন্টসিস পাইপ টানছে।

মালিক খুশী মনে ব্রেন্টসিসকে কিছু দিতে চাইল। কিন্তু তার কিসের অভাব? একটা থাকবার জায়গা পেলেই হল। একটা পুরনো স্নানঘরেই সে দিন কাটাতে লাগল। সবই তার আছে কাজেই কিছুই দরকার নেই তার। দেশের গরীব-দুঃখীদের টাকাকড়ি মোহর যা ছিল সবই বিলিয়ে দিল সে।

এমনি ভাবে অনেকদিন কেটে যাবার পর হঠাৎ অসুখী হয়ে ব্রেন্টসিস মারা গেল।

মরবার আগে সে বলে গিয়েছিল ঝোলাটা যেন কবরে তার মাথার কাছে রাখা হয়। তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ হল।

মরে গিয়ে ব্রেন্টসিস ঝোলা হাতে স্বর্গে উঠে ভেতরে যেতে

চাইল। কিন্তু দ্বারপাল পিটার বললেন, "তোমাকে ঢুকতে দেব না। জারের কাছে পঁচিশ বছর চাকরির মধ্যে কত পাপই না তুমি করেছ। যাও নরকে।"

ব্রেণ্টসিস আর কি করে। নরকে গিয়ে সে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, "দরজা খোল।"

দ্বাররক্ষক দরজার শব্দ শুনে তার কর্তাদের সে-কথা বলল। ছ'মাথাওয়ালা, ন'মাথাওয়ালা, বারমাথা-ওয়ালা ভূতেরা দৌড়ে এসে ঝোলা হাতে ব্রেণ্টসিসকে দেখেই দে দৌড়। কেবল দ্বারপালকে বলে গেল দরজাটা বন্ধই রাখতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্রেণ্টসিসের পা ব্যথা হয়ে গেল। কি ব্যাপার? সরাইওয়ালার চেয়েও কি এরা খারাপ? শেষে ব্রেণ্টসিস বাধ্য হয়ে স্বর্গেই ফিরে গেল। কিন্তু দ্বারপাল তাকে কিছুতেই ঢুকতে দেবেন না।

এই অনিয়ম দেখে ব্রেণ্টসিস চটে গিয়ে বলল, "তবে আসুন আমার ঝোলার মধ্যে।" সঙ্গে সঙ্গে দ্বারপাল ঝোলার মধ্যে বন্দী। তখন ব্রেণ্টসিস স্বর্গে ঢুকে পড়ল। দেখল জায়গাটা কত সুন্দর! জলবাদলা নেই, সূর্যের তাপও নেই। সেখানেই ব্রেণ্টসিস দিন কাটাতে লাগল পাইপ টেনে টেনে।

সেই থেকে স্বর্গের অসাধারণত্ব নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু নিয়মকানুন ঠিক হল। পৃথিবীতে থাকতে ব্রেণ্টসিস অনেক দুঃখ পেয়েছিল। কাজেই স্বর্গে কাকে ঢুকতে দিতে হবে আর না হবে সে ভালই বুঝতে পারত।

পশুপাখিদের কৃতজ্ঞতা

এক বুড়ো আর তার তিন ছেলে—দু ছেলে খুব চালাক চতুর, আর এক জন একেবারে বোকা। বুড়োর টাকাকড়ি নেই কিছুই, কাজেই ছেলেদের কাজে পাঠাতে হল। সঙ্গে সে দিয়ে দিল তিন ছেলের জন্য তিন বাটি ভাত।

যেতে যেতে এদের খুব খিদে পেয়ে গেল। তখন চালাক ভাইয়েরা বলল, "সব খাবার খরচ করে ফেলে কি হবে? তার চেয়ে এখন বোকারামের ভাতগুলা খাওয়া যাক। ওর বোঝাটাও হালকা হবে।"

তাই হল। ছোট ভাই বোকারামের খাবার খেয়ে নিয়ে ওরা আরও এগিয়ে চলল।

যেতে যেতে দুপুরের খাবার সময় হল। বড় ভাই দুজন নিজেদের খাবার খুলে বেশ মজা করে খেতে লাগল আর ছোটকে কিছুই দিল না। সে বেচারা বলল "বড়দা, মেজদা, আমার যে খিদে পেয়েছে।"

—"নিজের খাবার নিজে আগে খেয়ে নিয়েছিস যেমন। এখন আর তোকে কে খেতে দেবে?" সুতরাং ছোট ভাইয়ের কিছুই জুটল না।

আবার পথ চলতে চলতে রাতে খাবার সময়ও হয়ে গেল। বড় ভাই, মেজ ভাই নিজের নিজের খাবার খেতে শুরু করে দিল। ছোট ভাই বলল, "বড়দা, মেজদা, আমার খিদে পেয়েছে।"

—"নিজের খাবার রাখিস নি কেন? তোর বাটি কি ছেঁদা?"

ছোট ভাইকে না খেয়েই ঘুমোতে হল। সকালে উঠে সে দেখে দাদারা তাকে বনের মধ্যে ফেলেই চলে গেছে। সে এখন কি করে? বনের বাইরে সে যাবেই যেমন করেই হোক।

যেতে যেতে সে দেখে একটা পিঁপড়ের ঢিপি। ঝড়ে একটা ছোট গাছ সেই ঢিপির উপর পড়ে গেছে আর পিঁপড়েগুলো ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কিছুই করতে পারছে না। বোকারামের দয়া হল, গাছটার তলায় কাঁধ লাগিয়ে চাড় দিয়ে সে ওটাকে সরিয়ে দিল।

পিঁপড়েরা বলল, "অনেক, অনেক ধন্যবাদ! যদি তুমি কোনদিন বিপদে পড় আমাদের ডেকো। আমরা তোমায় সাহায্য করব।"

বোকারাম এগিয়ে চলল। খানিকদূর গিয়ে সে দেখতে পেল একটা ভাল্লুক গাছের উপর উঠে মৌচাক ভেঙ্গে মধু খেতে যাচ্ছে। মৌমাছিগুলো এধার-ওধার গুণগুণ করে উড়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু ভাল্লুকটা বেপরোয়া। বোকারামের কষ্ট হল। সে তার খাবারের বাটিটা ভাল্লুকটাকে ছুঁড়ে মারল। বাঁই করে সেটা গিয়ে লাগল ভাল্লুকের নাকে। সে তো ভয় পেয়ে তরতর করে গাছ থেকে নেবে দে দৌড়!

—"অনেক, অনেক ধন্যবাদ! যদি তুমি কোনদিন বিপদে পড় আমাদের ডেকো। আমরা তোমায় সাহায্য করব।" বলল মৌমাছিগুলো।

আরও খানিকদূর গিয়ে বোকারাম শুনল একটা কাক 'কা কা' করে কাঁদছে। কি হয়েছে?—ওর ছানাটা পড়ে গেছে গাছতলায় বাসা থেকে। বোকারাম কি ভেবে ছানাটাকে

বাসায় তুলে দিল। কাক বলল, "অনেক, অনেক ধন্যবাদ, ভাই! তোমার দুঃখের দিনে তোমায় সাহায্য করব আমি।"

আরও কিছুদূর গিয়ে বোকারাম দেখে একটা বিরাট প্রাসাদ। সে ঠিক করল ঐ প্রাসাদের মালিকের কাছে কাজ করবে।

মালিক তার কথা শুনে বললেন, "তোমায় তিনটে কাজ করতে দেব। যদি করতে পার তবে এক থলি মোহর দেব। না পারলে কিন্তু গর্দান যাবে।"

বোকারাম বলল, "বেশ। কি আর করি? ওদিকে বাবা আমাদের আয়ের জন্য বসে রয়েছে।"

সন্ধ্যাবেলা মালিক প্রথম কাজ দিলেন।

—"যাও। আজই রাত্রে আমার সব ধান ভেঙ্গে, ঝেড়ে গোলায় তুলে রাখতে হবে।" এদিকে তাঁর জমিও বিরাট।

বোকারাম গালে হাত দিয়ে উনুনের পাশে বসে বসে চোখের জল ফেলে। কেমন করে সে এই কাজ করে? হঠাৎ পিঁপড়ের রাজা এসে উপস্থিত, বলল, "কি হল ভাই বোকারাম? তুমি এত মুষড়ে পড়েছ কেন?"

বোকারামের মুখে সব কথা শুনে সে আবার বলল, "ওঃ, এই ব্যাপার! তুমি কিছু ভেবো না। আমি ব্যবস্থা করছি।"

সঙ্গে সঙ্গেই লাখ লাখ পিঁপড়ের সারি কাজে লেগে গেল। আর ভোরের আলো ফোটবার আগেই সব ধান ভেঙ্গে ঝাড়াই হয়ে পাহাড়-প্রমাণ গোলা ভর্তি করে জমা হল।

সকালবেলা কর্তামশাই দেখে তো অবাক। একজন লোক এত কাজ একরাত্রে করে কি করে?

যাই হোক, দ্বিতীয় কাজটা তিনি দিলেন বোকারামকে

সন্ধ্যাবেলায় ;—"ঐ ছোট পাহাড়টার উপর আজ রাতের মধ্যেই আমার চাই একটা মোমের গীর্জা। না পারলে কি হবে বুঝতেই পারছ।"

পাহাড়টার উপর বসে বসে বোকারাম ভাবছে আর ভাবছে। কি আর করবে? হঠাৎ মৌমাছিদের রানী তার সামনে এসে গুণগুণ করে বলল, "কি হয়েছে তোমার? তোমার মুখ এত ভার কেন, বোকারাম?"

বোকারাম সব বলল। তখন মৌরানী বলল, "ভেবো না কিচ্ছু। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।"

কিছুক্ষণের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি এসে গীর্জে গড়তে লাগল। সকাল হওয়ার আগেই কাজ শেষ—এত সুন্দর গীর্জে তৈরি হল যে আর চোখ ফেরান যায় না।

সকালবেলা কর্তামশাই ব্যাপার দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলেন—সত্যি কি অপূর্ব সুন্দরই না হয়েছে! সন্ধ্যাবেলা কর্তামশাই বললেন, "ওহে, ঐ গীর্জের চুড়োয় একটা সোনার মোরগ বসাতে হবে। যদি না পার তবে ঠেলা বুঝবে।"

বেচারা বোকারাম গীর্জের দরজার চৌকাঠে বসে বসে ভাবতে লাগল কি করা যায়? কেমন করে মোরগ পাবে? হঠাৎ সেই কাকটা উড়ে এসে প্রশ্ন করল, "কি ভায়া? এত চুপচাপ কি ভাবছ? হল কি?"

বোকারাম সব খুলে বলল।

কাক বলল, "আরে ঘাবড়িও না। আমি তোমার দুঃখ দূর করছি। আমার পিঠে বস দেখি। যাওয়া যাক এক দৈত্যের দুর্গে যেখানে ঐ সোনার মোরগ থাকে।"

বোকারাম কাকের পিঠে উঠে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই

সেই দুর্গে পৌঁছে গেল। কাকটা জানালা দিয়ে ঢুকে গেল, মোরগের ঝুঁটিটা ধরে বাইরে বেরিয়ে এল। কিন্তু কাক তো আর বোকারাম আর মোরগ দুজনকে নিয়ে উড়তে পারে না —তাই বোকারাম কাকের পেছন পেছন দৌড়তে দৌড়তে আসতে লাগল।

ঘুম ভেঙ্গে দৈত্যটা দেখে মোরগটা চুরি হয়ে গেছে। সে ছুটল মোরগের খোঁজে। শেষে বোকারামকে ধরে ফেলে আর কি। বোকারাম ভাবল গেলুম বুঝি। কিন্তু কাকটা তার ডানা ঝেড়ে এককোঁটা জল ফেলতেই একটা বিরাট হ্রদ হয়ে গেল দৈত্য আর বোকারামদের মাঝে। দৈত্যটা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু হ্রদও খুব গভীর। কাজেই দৈত্যটা একটা নৌকা করে আসতে না আসতেই এরা অনেক দূরে চলে গেল।

হ্রদ পার হয়েই দৈত্যটা বোকারামের খুব কাছাকাছি এসে পড়ল। বোকারাম মনে মনে ভাবল এই বুঝি তার শেষ। কিন্তু এবার কাকটা তার ডানা ঝটপটিয়ে কয়েক গুঁড়ো বালি ফেলে দিতেই একটা বিরাট পাহাড় তৈরি হয়ে গেল। দৈত্যটা যতই জোরে ছুটুক, এখন তাকে ঐ ভীষণ উঁচু পাহাড়টায় চড়তে হবে তো। তাই সে একটা কোদাল আনতে ছুটল আর ইতিমধ্যে এরাও অনেক দূরে পালিয়ে গেল।

কোদাল দিয়ে পাহাড় কুপিয়ে ফেলে দৈত্য চার লাফে একেবারে বোকারামের ঠিক পেছনেই এসে উপস্থিত। বোকারাম ভাবল আর আশা নেই। কিন্তু কাকটা আবার এক ঝাপটায় একটা পালক ফেলে দিল। আর একটা ঘন বন দৈত্যটাকে আড়াল করে ফেলল। তাই দেখে দৈত্য

কোথা থেকে একটা কুড়ুল জোগাড় করতে ছুটল। এর মধ্যে এরা সেই প্রাসাদে ফিরে এসে মোরগটাকে গীর্জের চূড়ো বসিয়ে দিয়েছে।

সকালবেলা কর্তামশাই মোরগ দেখে বোকারামের পিঠ চাপড়ে বললেন, "সাবাস্।" তারপর তিনি তাকে নিজের কাছেই রাখতে চাইলেন—এমন কি জামাই করে। কিন্তু বোকারাম রাজী নয়। মাইনেপত্তর নিয়ে সে ফিরে গেল বাপের কাছে। ওদিকে তার বড় ভাইয়েরা বাপের কাছে কেমন করে বোকারাম হারিয়ে গেছে আর তারা কত কষ্ট করে খুঁজেও তাকে পায়নি এইসব কথা খুব ফলাও করে বানিয়ে বানিয়ে বলছিল।

কিন্তু এখন ছোট ভাই তাদের সব মিথ্যে কথা ফাঁস করে দিল। ওদের বাবা ভীষণ চটে গিয়ে বড় ভাই আর মেজ ভাইকে তাড়িয়ে দিল। তারপর ছোট ছেলের সঙ্গে মনের সুখে বসবাস করতে লাগল।

কুকুরের জুতো তৈরি

একসময় এক কৃপণ লোক ছিল। তার একটা কুকুর ছিল—খুব বুড়ো। বয়সের দরুণ তার দাঁতগুলোর ধার নষ্ট হয়ে গেছে আর সে ছুটতেও তেমন আর পারে না। কাজেই ভেড়ার পাল থেকে নেকড়ে বাঘে প্রায়ই ভেড়া ধরে নিয়ে যায়। শেষে মনিব রেগেমেগে কুকুরকে বলল একদিন, "তোকে আর খাওয়াব কেন বসিয়ে বসিয়ে? যা, বেরো আমার সামনে থেকে।" এই বলে সে কুকুরটাকে মেরে তাড়িয়ে দিল।

ঘুরতে ঘুরতে কুকুরের দেখা এক নেকড়ে বাঘের সঙ্গে। নেকড়ে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?"

—"আর কেন? চাকরির খোঁজ করছি।"

—"কি কাজ জান তুমি?"

—"জুতো সেলাই করতে।"

নেকড়ের অনেকদিনের ইচ্ছে ভদ্রলোকের মত জুতো পরে। সে বলল, "আমার পায়ের একজোড়া জুতো করে দিতে পারবে?"

—"কেন পারব না? করে দেব। কেবল আমার একটা ভেড়া চাই। চামড়া না হলে কি আর জুতো হয়।"

—"এ আর এমন কি?" এই বলে নেকড়ে চলে গেল। আর কিছুক্ষণ পরে একটা ভেড়া মেরে টানতে টানতে এনে, বলল, "খুব কি দেরী হবে জুতো তৈরি হতে?"

কুকুরটা ভাল করে মরা ভেড়াটা দেখে বলল, "দু সপ্তাহ পরে আসবেন।"

দু সপ্তাহ পরে নেকড়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, "কি ওস্তাদ! জুতো হয়েছে?"

ভেড়ার খুরগুলো দিয়ে কুকুর বলল, "অনেকদিন। পরুন, পরুন।"

নেকড়ে পরতে চেষ্টা করল। এপাশ, ওপাশ, এরকম সেরকম করে কিছুতেই জুতো আর পায়ে হয় না।

—"এঃ ওস্তাদ! এত ছোট জুতো করেছ কেন?"

—"কি বললেন? ভেড়ার চামড়ায় কি আর আপনার জুতো হয়? আমার চাই একটা এঁড়ে বাছুর। আপনার পাগুলো বড় বড় কি না।"

—"বেশ।" নেকড়ে চলে গেল। পরের দিন নিয়ে এল একটা বাছুর।

কুকুর অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে /আঁকজোক করে বলল, "এতে আরও দেরী হবে। বেশ, ছ সপ্তাহ পরে আসবেন।"

ছ'হপ্তা পরে নেকড়ে বাঘ এসে জিজ্ঞাসা করল, "কি ওস্তাদ! আমার জুতো কই?"

—"সে তো অনেকদিন তৈরি হয়ে গেছে। পায়ে দিন, পায়ে দিন।"

কুকুরটা বাছুরের খুরগুলো এগিয়ে দেয়। নেকড়ে পরতে চেষ্টা করেও পারে না। শেষে বলে, "কি ওস্তাদ! এত ছোট জুতো করলে কেন?"

—"এঃ হে, আমি আর কি করি! আপনার পা যা বড়। আপনাকে একটা ঘোড়া আনতে হবে দেখছি।"

—"বেশ, বেশ।" নেকড়ে চলে গেল। একটা ঘোড়া

মেরে এনে সে কুকুরকে বলল, "এই নাও তোমার ঘোড়া। কবে জুতো পাব ?"

ওস্তাদ মুচি ভাল করে ঘোড়াকে দেখল। অনেকদিনের খাবার পাওয়া গেছে।

—"ন সপ্তাহ পরে আসবেন জুতোর জন্য।"

ন সপ্তাহ পরে নেকড়ে আবার এল।

—"আমার জুতো হয়েছে ?"

—"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, পরুন পরুন।" কুকুর ঘোড়ার খুরগুলো এগিয়ে দিতে দিতে বলে।

কষ্টেসৃষ্টে নেকড়ে তো খুরগুলো পরতে লাগল। পায়ে ঠিকই হয়েছে। বরফ জমা একটা নদীর উপর দিয়ে হেঁটে নেকড়ে বাড়ি চলল। হঠাৎ পা পিছলে সে একেবারে ধড়াস করে বরফের উপর পড়ে গেল। মাথায় বেশ চোট লাগল। যা ঘোড়ার পক্ষে ভাল তা নেকড়েকে নাও মানাতে পারে। ব্যাপার দেখে কুকুর তো হেসে লুটোপুটি। নেকড়ে চটে আগুন। কি ? একটা সামান্য মুচি তার মত ভদ্রলোককে ঠাট্টা করতে সাহস পায় ?

—"ওহে, তুমি আমাকে দেখে হাসছ কেন ? চলে এস, তোমার সঙ্গে একহাত হয়ে যাক।"

—"কি, আমার সঙ্গে লড়াই ? বেশ। সত্যিই যদি আপনি লড়তে চান তবে সব কিছু আইনমত হওয়া চাই। আপনি আপনার বন্ধুবান্ধবদের আনুন, আমিও আনছি। কাল বড় পাইন গাছটার তলায় দেখা হবে, ঐ যেখানে শুকনো ডাল পাতাগুলো আছে।"

জুতোটা খুলতে খুলতে কুকুরকে দিয়ে নেকড়ে বলল,

"বেশ, তাই হবে। ততক্ষণ এগুলো তোমার কাছেই থাকুক।"

কুকুর গিয়ে বেড়াল আর মোরগের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে ওদের নিয়ে বনের ধারে পাইন গাছের দিকে চলল। নেকড়েও ভাল্লুক আর শুয়োরের সঙ্গে ঠিকঠাক করে ঐখানে গেল।

কুকুর আর তার সঙ্গীদের আসতে একটু দেরী হচ্ছে দেখে ভাল্লুক পাইন গাছে উঠে কি ব্যাপার দেখছিল। হঠাৎ সে গরর-গরর করে বলল, "ভগবান জানেন, কি হবে! ওদের একজন বর্শা উঁচিয়ে আসছে, আর একজন পথে পাথর কুড়োচ্ছে। আমরা মুস্কিলে না পড়ি।"

নেকড়ে ভয় পেয়ে শুয়োরকে বলল, "এস বন্ধু, আমরা শুকনো ডাল পালাগুলোর আড়ালে লুকোই, ভাল্লুকই ওদের সামলাবে।"

ভাল্লুক বলল, "তবে রে, আমিই বা কেন একা যাই? এই পাইন গাছেই বরং আমি থাকি। এ জায়গাটা বেশ ভাল।"

কুকুর এদিকে আসছে। বেড়ালটা লেজ খাড়া করে আসছে আর মোরগটা পথে নানান পোকামাকড় খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। শুকনো ডাল পালাগুলোর কাছে এসেও কারুকে না দেখতে পেয়ে ওরা বসে রইল—বসেই রইল। হঠাৎ বেড়ালটা দেখে শুয়োরের লেজটা ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি মারছে। সেটাকে একটা ইঁদুর ভেবে একদৌড়ে গিয়ে বেড়ালভায়া কষে কামড় দিয়েছে লাগিয়ে। শুয়োরটা হকচকিয়ে গিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে যেদিকে পারে ছোটাছুটি

করতে লাগল আর নেকড়েও তার পিছু পিছু দৌড়ল। ও ভাবল, "বাবা শুয়োরই যদি পালায় তবে আমি থাকি কোন্ সাহসে ?" এই ভেবে সে মোরগটার দিকেই ছুট দিল। মোরগটা ভয় পেয়ে উড়ে ঝটাপট করে চলল পাইন গাছের দিকে।

ভাল্লুক দেখল, "এইরে। এবার আমার পালা। ওরা তো মরেছে, এবার আমিও গেলুম।" এই ভেবে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে ধপাস করে একেবারে শক্ত মাটিতে আছড়ে পড়ল। কোন রকমে গা ঝেড়ে উঠেই একেবারে এক লম্বা দৌড় !

এমনিভাবে সবাই গহন বনের মধ্যে ঢুকে পড়ে হাঁফ ছাড়ল। কোনরকমে দম নিয়ে শুয়োর বলল, "ও ! আমার লেজটা একেবারে সাঁড়াশি দিয়ে কেটে নিয়েছে, বাবাঃ।

নেকড়ে বলল, "আমার প্রাণ আর একটু হলে বর্শার ঘায়ে গিয়েছিল বলে।"

ভাল্লুক বলল, "তোমাদের আর কি হল ? আমাকে একদম খোদ শয়তানের হাতেই পড়তে হয়েছিল। তার হাতে ছুরি, পায়েও ছুরি আবার মাথাতেও ছুরি। আমায় দেখে গর্জন করে বলল, 'কে এই ডালে ?' শুনেই আমি দেখলুম ব্যাপার ঘোরালো। ভগবানের দয়া যে বেঁচে ফিরে এসেছি।"

নেকড়ে চুপ করে গেল।

এরপর থেকেই সবাই বলে নেকড়ে আর কুকুরে এত ঝগড়া।

জমিদারের দিন বাড়ানো

এক জমিদার সবসময় তার কৃষকদের উপর অত্যাচার করতেন। তারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রাণপাত করে পরিশ্রম করত কিন্তু তিনি ভাবতেন কাজ বেশী হল না, সবাই ফাঁকি দিয়েছে। সব সময়েই তিনি গজগজ করতেন, "দিনটা বড় ছোট, দিনটা বড় ছোট" আর "মজুরদের মাইনে বেশী" বলে। জমিদারের খেত-খামার যা ছিল তার সন্ধান পাবার জন্য সবাই সাধনা করত। কিন্তু এঁর লোভও ছিল সীমাহীন। সারাদিন তিনি ঘুরে বেড়াতেন আর গজগজ করতেন।

একজন কৃষক তাঁর এই ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে একটা ফন্দি আঁটল। জমিদারকে সে বলল, "হুজুর, দিনটা একটু বাড়িয়ে দিতে পারলেই হয়। একটা কাঁটাচামচের কাঁটার মত ত্রিশূল করে সূর্যটাকে গেঁথে ফেললেই আর সূর্য তো আকাশে চলতে পারবে না।"

শুনে জমিদারের আনন্দ আর ধরে না। এক কামারের কাছ থেকে একটা বিরাট ত্রিশূল বানান হল। ত্রিশূলটা একটা লম্বা ডাণ্ডায় লাগিয়ে জমিদার কোথা থেকে সেটা সূর্যে লাগানো যায় ভাবতে লাগলেন। তিনি বললেন, "ওহে, শোন সবাই। এবার থেকে যতক্ষণ আমি সূর্যকে ধরে থাকব ততক্ষণ তোমাদের কাজ করতে হবে। রাজী থাক তো থাক, না হলে যেতে পার।" এই বলে তিনি একটা ছোট পাহাড়ে উঠতে লাগলেন।

দুপুরবেলা সূর্যের দিকে ত্রিশূল তুলে তিনি ধরে রইলেন।

এক ঘণ্টা কেটে গেল……আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। জমিদার দাঁড়িয়ে আছেন তো আছেনই। ঘামে সারা শরীর ভিজে যাচ্ছে, হাত পা থরথর করে কাঁপছে, কোমর টনটন করছে, সব শক্তি যেন বেরিয়ে গেছে! তাঁর হাত থেকে কাঁটাটা পড়ে গেল, আর নীচু হবার ক্ষমতাও তাঁর নেই।

কৃষকেরা দেখল তাদের মনিব আর সূর্যকে ধরে নেই। কাজেই চুক্তিমত তারা কাজ বন্ধ করে দিল। জমিদার সূর্যের দিকে তাকিয়ে দাঁত কিড়মিড়িয়ে উঠলেন—এখন সূর্য মাথার উপর আর ওদিকে সবাই বাড়ি চলে গেল।

কোনরকমে কষ্টেসৃষ্টে তিনি বাড়ি ফিরলেন। জমিদার-পত্নী তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "তুমি কাল বিকেলের দিকে সূর্যকে ধরবে। তখন তো সূর্য অনেক নীচে থাকে—ধরাও সুবিধে হবে।"

জমিদারমশাই রাজী হলেন। পরের দিন বিকেলবেলা বিছানা ছেড়ে উঠে তিনি পাহাড়টার দিকে ত্রিশূল হাতে চললেন। সত্যিই সূর্য অনেক নীচেই রয়েছে। কাঁটাটা তুলতে তুলতে তিনি ভাবলেন, "আজ এই কুঁড়ে লোকগুলোকে খাটিয়ে মারব।"

এইবার কিন্তু তাঁর কাজ আরও শক্ত মনে হল। যেই-মাত্র তিনি ত্রিশূলটা ধরেছেন অমনি তাঁর চোখ জ্বালা করতে লাগল, চোখের সামনে লাল লাল চাকা ঘুরতে লাগল যেন, আর তিনি এক আঁটি খড়ের মত ধুপ করে মাটিতে পড়ে গেলেন।

তাঁর বৌ তাঁকে তুলে ধরতে ধরতে বললেন, "কাল তুমি যেই সূর্য ডুবতে যাবে অমনি ধরবে।"

জমিদারমশাই তাঁর দিকে তাকালেন, কিছু আর বললেন না। আর দিন বাড়িয়ে কাজ নেই তাঁর, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে !

ওস্তাদ সাকরেদ

এক কামার। যতদিন তার বয়স কম ছিল প্রাণপণ শক্তিতে সে কাজ করত। কখন যে সে বুড়ো হয়েছে সে খেয়ালই তার নেই। এমন এক সময় এল যখন সে আর হাতুড়িই তুলতে পারে না। লোকে তার কামারশালে আসে। কিন্তু বয়সকালের সে গায়ের জোর আর তার নেই।

খরিদ্দাররা তাকে খুব বকাবকি করতে লাগল। বুড়ো ভাবে ভাগ্যই খারাপ, মরার সময় হল বুঝি। একটা ছোট্ট ফুটফুটে ছেলে দরজার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, "ও বুড়ো! তোমার একজন সাকরেদ চাই, না?"

—"সাকরেদ আর পাব কোথায়? আমার নিজেরই কাজ নেই। আমার সময় হয়েছে কে আর আমার কাছে কাজ করাতে আসবে?"

—"আহা, দুঃখ করো না। আমরা দুজনে কাজ করলে খাওয়া পরা চলে যাবে।"

—"বেশ, তাই হবে।"

ছেলেটা তার লম্বা আলখাল্লা পরে, হাতগুটিয়ে, চুল সামলে আগুন জ্বালাল। সবই হল, কিন্তু কোন কাজই নেই।

এমন সময় সেখান দিয়ে এক বুড়ি ভিখারিনী যাচ্ছিল। ছেলেটা বলল, "ঐ দেখ বুড়ো, কাজ মিলেছে।" এই বলে সে একলাফে বাইরে গিয়ে বুড়িকে পাঁজাকোলা করে তুলে একেবারে চুল্লীতে ফেলে দিল। বুড়োকে বলল, "হাপর চালাও জোরসে।"

কেমন সাকরেদরে বাবাঃ! বুড়ো হাত কামড়াতে লাগল। কিন্তু ছেলেটা সাঁড়াশী দিয়ে বুড়িকে বেশ করে ঝলসাতে লাগল—মাঝে মাঝে বুড়োকে হাপর করতে বলছে আর নিজে হাতুড়ি পিটছে। চারধারে চটাপট চটাপট আওয়াজ হতে লাগল। পিটে পিটে শেষে সে কি একটা মেঝেতে রাখল ঠাণ্ডা হতে। আর কি আশ্চর্য! বুড়ো দেখে, বুড়ির বদলে বছর কুড়ি বয়সের এক পরমাসুন্দরী মেয়ে।

সাকরেদ বলল, "কেমন বুড়ো, কি বলেছিলাম? নাও, এখন কেবল কাজ জোগাড় করে যাও। কিন্তু মনে রেখ—কেবল গরীবদের কাজ করবে, পয়সা নেবে না, আর বড়লোকদের কাছে যাবে না—বুড়ো হলে তাদের তো কিছু কষ্ট নেই।"

দিকে দিকে বুড়ো কামারের নাম ছড়িয়ে পড়ল। বুড়ো লোককে সে পুড়িয়ে-পিটিয়ে যুবক করে দিতে পারে। লোকে দল বেঁধে তার কামারশালে আসে, আর বুড়ো দেখে—খোঁড়া, বেঁকাচোরা, কুঁজোদের শীতে আর খিধেয় যারা কাঁপছে, টলছে। কেউ আসে যার মনিবে চোখ উপড়ে নিয়েছে, কারুর পেছনে বা মনিব কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে। আবার কেউ আসে যে সর্বশক্তি ক্ষয় করে মনিবের সেবা করেছে অথচ মাইনে পায়নি, ধর্মযাজকদের পেট ভর্তি করেছে কিন্তু নিজে পেটেপিঠে এক হয়ে গেছে। দুই কামারে মিলে সারাদিন কাজ করে কিন্তু কথামত এক পয়সাও চায় না, যে যা সাধ্যমত দেয় তাই নেয়। ব্যবসা বেশ ভালই চলছে। একদিন শেষে সাকরেদ বলল, "শোন বুড়ো! এখন তুমি বুড়ো বয়সে চালিয়ে নিতে পারবে। আমি চল্লুম, আর থাকতে পারব না। যাবার আগে বলে যাচ্ছি আর ব্যবসা করো না,

শেষে বিপদ হবে।" এই বলে সে উধাও হয়ে গেল বুড়োকে রেখে।

পরে কামারশালে যে কেবল গরীবেরা এল তাই নয়, বড়লোকের দলও ভিড় করল। নাকের সামনে টাকা বাজিয়ে তারা প্রত্যেকে আগে যাবার জন্য পরস্পর ঝগড়া করতে শুরু করল।

বুড়ো বলল, "দেখুন, ঘোড়ার খুর আমি কোনরকমে তৈরি করে দিয়েছি আপনাদের। অন্য সব ব্যাপার আমার সাকরেদই জানত, কিন্তু সে কোথায় চলে গেছে। পারেন তো তাকে খুঁজে বার করুন।"

কিন্তু বড়লোকগুলো তাকে ছাড়বে না। তারা তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। তারা একবার চলে যায় আবার ফিরে আসে।

শেষে এক আদ্যিকালের থুত্থুড়ে বুড়ি ঠক্‌ঠক্ করতে করতে এসে হাজির। সে বলল যে তাকে ছোট করে দিলে কামার-শাল ভর্তি করে সোনা বুড়োকে দেবে। কেঁদে কেটে, ইনিয়ে বিনিয়ে সে বলতে লাগল সারা জীবন বোকার মত কাটিয়ে এখন মনে হচ্ছে কেমন করে জীবন কাটান উচিত ছিল। বুড়ো শুনল অনেকক্ষণ ধরে, শেষে ভেবে ভেবে রাজী হল।

বুড়ি নিজেই নেহাই-এর উপর শুয়ে বলল যেন তাকে এক ঘা অন্তত হাতুড়ির বাড়ি মারা হয়। বুড়ো আর সামলাতে পারল না, তার দুঃখ হল বুড়ির জন্য। বুড়িকে সাঁড়াশী দিয়ে ধরে সে আগুনে ফেলল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারল তার দ্বারা বুড়িকে যুবতী করা যাবে না। ভীষণ ভয় পেয়ে

সে বলতে লাগল, "কই আমার ওস্তাদ সাকরেদ, এই বুড়িকে বাঁচাও।"

যেই না একথা বলা অমনি ওস্তাদ সাকরেদ ঘরের দরজায় এসে রেগে-মেগে বলল, "আমি যা বলেছিলুম ভুলে গেছ বুঝি ?

যাই হোক, সেও দেখল বুড়িকে বাঁচাতে হবে। সে নিজের হাতে সাঁড়াশী হাতুড়ি নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুড়িকে কয়েক ঘা পিটে মাটিতে ঠাণ্ডা হতে দিল। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! বড়-লোক বুড়ির জায়গায় একটা কাল বেড়াল হল যে! বেড়ালটা গোঁফ কুঁচকে, লোম খাড়া করে, লেজ উঁচিয়ে তাদের দিকে কটমট করে চেয়ে ম্যাও করে ডেকে দৌড়ে বনে চলে গেল।

সাকরেদ বলল, "বড়লোক থেকে মানুষ তৈরি করা বড়ই শক্ত।"

বড়লোক ভুঁড়িওলা লোকগুলো একথা শুনে আর কোন কথা না বলেই একেবারে উধাও।

চড়াই ও বিড়াল

একটা পায়রা আর এক চড়াই পাখিতে মিলে ঠিক করল তাড়ি তৈরি করবে।

বেশ ফেনাশুদ্ধ তাড়ি তৈরি হলে দুজনেই খেতে শুরু করে দিল। একবার দুবার খাওয়া হয়ে গেল। পায়রা বলল, "বকবকম বক! খারাপ হবে। বকবকম বক! খারাপ হবে।" কিন্তু চড়াই বলল, "পিড়িক! পিড়িক! না! না!"

আবার তারা এক পেয়ালা করে তাড়ি খেল। পায়রা আবার বলল, "বকবকম বক, খারাপ হবে!" কিন্তু চড়াই আবার উত্তর দিল, "না, না, পিড়িক পিড়িক!"

পায়রা বেশ বড়সড়, তার ভয় নেই। কিন্তু ছোট্ট চড়াই মাতাল হয়ে ঘাসের উপর গড়াগড়ি খেতে লাগল। পায়রা একটা গাছের ডালে বসে বলতে লাগল, "বকবকম বক, খারাপ হবে, খারাপ হবে।"

ওদিকে চড়াইও কেবল বলে যেতে লাগল, "পিড়িক, না, পিড়িক, না!"

হঠাৎ কোথা হতে একটা বেড়াল এসে খপ করে চড়াইকে ধরে ফেলল। পায়রা দেখল, চড়াই এবার মারা পড়ল। সে আবার চেঁচাল, "খারাপ হবে, খারাপ হবে।"

বেড়াল থমকে গিয়ে ভাবতে লাগল কেন তার খারাপ হবে।

ইতিমধ্যে চড়াই জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। সে বলল বেড়ালকে

"বেড়াল মশাই, আপনি এত বড় বংশের ছেলে হয়ে নুন না দিয়ে আমায় খাবেন কেমন করে ?"

বেড়াল চড়াইকে ফেলে ছুটল নুনের সন্ধানে। কিন্তু এর ততক্ষণে নেশার ঘোর কেটে গেছে। একটা বেড়ার উপর উড়ে গিয়ে বসে সে গাইল, "পিড়িক পিড়িক, না, না !"

এমনিভাবে চড়াই বেড়ালের হাত থেকে বাঁচল। আর সেই থেকে পায়রা আর চড়াইয়ে এত বন্ধুত্ব। পায়রা সব সময়েই বন্ধুর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, "খারাপ হবে, বকবকম বক, খারাপ হবে !"

কিন্তু চড়াই সব সময় উত্তর দেয়, "পিড়িক, পিড়িক, না, না !"

গরু থেকে মানুষ

রিগা নামে এক শহরের একজন গরু ব্যবসায়ী এক মেলায় এসে খুব দম্ভ করতে লাগল যেন কি-না কি হয়েছে। অন্য ব্যবসায়ীরা দেখে-শুনে বলল, "সত্যি দেখছি, রিগাতে গেলে যে কোন গরুই খুব ভদ্রলোক হতে পারে।"

এক বুড়ো এই কথা শুনে মনে মনে বলল, "আহা, আমার বাছুরটাকে যদি রিগায় নিয়ে যাই তবে সে তো বেশ একটা জবরদস্ত ভদ্রলোক হতে পারবে।" বাড়ি এসে বৌকে সে তার মনের কথা জানাল, "ও গিন্নী। মেলায় শুনলুম, রিগাতে গরু থেকে নাকি মানুষ হয়। আমাদের তো ছেলেপিলে নেই, কে খাওয়াবে আমাদের? চল, আমাদের বাছুরটা রিগায় নিয়ে যাই। মানুষ হয়ে সেই আমাদের খাওয়াবে। আমাদের বুড়ো বয়সে কষ্টের শেষ হবে।"

বুড়োর বৌ ছিল বুড়োরই মত বুদ্ধিমতী! কাজেই সেও রাজী হয়ে গেল। সুতরাং তারা তাদের বাছুরটা নিয়ে রিগার পথে এগোল।

রিগায় এসে সত্যিই তারা অনেক ভদ্রলোক দেখতে পেল। কাকে এখন জিজ্ঞাসা করা যায় বাছুরটা কোথায় নিয়ে গেলে তাকে মানুষ করা যাবে? ভাগ্যক্রমে তারা দেখা পেল সেই ব্যবসায়ীটির যে ঐ মেলাতে এসেছিল। তার সব জানাশুনো আছে ভেবে তাকেই বুড়োবুড়ি শুধল, কোন স্কুলে বাছুরটা দেওয়া যায়।

ব্যবসায়ীটি তাদের দেখে-শুনে আসল ব্যাপারটা বুঝল।

বাছুরটা তার কাছেই থাকবে যতদিন না সেটাকে একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করা যায়। বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, "পরিবর্তন হতে কি অনেক দিন লাগবে?"

"হ্যাঁ, তাতো লাগবেই। বছর তিনেক বাদে আসবেন। ততদিনে বোধহয় বাছুর থেকে ভদ্রলোক হয়ে যাবে।" বুড়ো-বুড়ি বাছুরটা রেখে বাড়ি ফিরে গেল।

তিন বছর পরে আবার তারা রিগায় এল। এতদিনে তাদের বাছুরকে দেখতে কেমন হয়েছে—এই ভাবতে ভাবতে তারা পথ চলছিল।

সেই ব্যবসায়ীর কাছে গিয়ে বুড়োবুড়ি জানতে চাইল তাদের বাছুর মানুষ হয়েছে কিনা আর তার ঠিকানাই বা কি। ওদের মাথায় তো আর এল না যে সে বাছুরের কবে বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। এ ব্যবসায়ী বোধহয় ভুলেই গেছে কেমন করে সে ঠকিয়ে ছিল সরল এই বুড়োবুড়িকে। অবশ্য এই ঠকানো বিদ্যা তার নতুন নয়। যাই হোক্, কিছুক্ষণ ভেবে সে বলল, "আহা, আপনাদের বাছুর তো এখন মস্তলোক। কোন ব্যবসায় ওকে দেব ঠিক করেছিলুম, কিন্তু সে রাজী না হয়ে উকিল হয়েছে। চোর-জোচ্চোরদের বাঁচায় সে এখন তার বুদ্ধি খরচ করে। ওর বাড়িতে যান না। দেখবেন লেখা আছে, 'উকিল শ্রীবৃষবৎস বসু।' ঐ আপনাদের বাছুর। ভেতরে যাবেন, তবে সে আপনাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে তা বলতে পারছি না।

খুঁজে খুঁজে উকিলের বাড়ি গিয়ে বুড়োবুড়ি দেখে সত্যিই কাঠের ফলকে লেখা রয়েছে, 'উকিল শ্রীবৃষবৎস বসু।' বুড়ো-বুড়ি "আমাদের বাছুর, আমাদের বাছুর" এই বলে চেঁচাতে

চেঁচাতে মক্কেল ভর্তি ঘরে ঢুকে পড়ল। চাকররা ছুটে এল। এই সব গরীব লোকদের কাছে বেশী টাকা মিলবে না বলে তাদের উকিলবাবুর কাছে নিয়ে যাওয়া মানা। কিন্তু বুড়ো ছাড়ে না, বলে, "আমরা বাইরের কেউ নই। এর মানে কি? আমাদের নিজেদের বাড়ি আমরা আসব, আর ঢুকতে পাব না? তোমরা কেবল ওকে জানাও আমরা এসেছি।" বাধ্য হয়ে চাকররা ওদের উকিলের কাছে নিয়ে গেল।

উকিলবাবু বসে আছেন টেবিলের সামনে মুখ ভারী করে, গায়ে দুধের মত সাদা জামা আর মাথায় কালো ছোট ছোট চুল। কতকগুলো কাগজপত্র ঝুঁকে পড়ে তিনি দেখছিলেন ঠিক যেমন গরুতে খড় খাবার সময় মুখ নীচু করে থাকে।

বুড়ো বলল, "আহা, আমার সোনা বাছুররে। কি সুন্দর তোর চুলগুলো—তোর মা তোকে চেটে চেটে যেমনটি করে রেখেছিল ঠিক তেমনিই রয়েছে। আর তোর গা-ও তো তেমনি দুধের মত সাদা। কিছুই পালটায় নি দেখছি।"

উকিল বেচারা হাঁ করে তাকিয়ে থেকে থেকেও কিছুই বুঝতে পারলেন না। শেষে বুড়োবুড়ির একই কথা বার বার শুনে রেগে গিয়ে তিনি হুকুম দিলেন ওদের তাড়িয়ে দিতে। আর চাকরদের হুকুম দেওয়া তো—বলবার আগেই কাজ হয়ে গেছে।

বুড়ো রাস্তায় বেরিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বুড়ি গো, কি আর করা যাবে? ওকে ছেড়ে রেখেই যেতে হল। দেখলে তো, গরুদের লেখাপড়া শেখাও আর যাই কর, স্বভাব যাবে কোথায়।"

গরীব মুচী আর মহাজন

এক মুচী ছিল। অনেক কষ্টে তার দিন চলত। ছেলে মেয়ে ছিল অনেকগুলি, আবার তার বৌয়ের ছিল অসুখ। উপায় করত সে একলা, অথচ এতগুলি পেট চালাতে হত তাকেই। কাজেই মণ্ডামিঠাই তো তার জুটত না, নুনভাত খেয়েই দিন কাটত। কোন কোন দিন তাও জুটত আধপেটা। এমনি করে একদিন এমন হল যে ঘরে আর একটি পয়সাও নেই। বাধ্য হয়ে মুচীভায়াকে যেতে হল পাশের বাড়ির বড়লোক,মালিকের কাছে টাকা ধার করতে।

টাকা ধার সে পেল, কিছুদিনের মধ্যে ফিরিয়ে দেবে এই শর্তে। শর্তে রাজী হয়ে সে বাড়ি ফিরে এল। কিন্তু কথা দেওয়া এক আর কথার মত কাজ করা আর এক। টাকা ফেরত দেবার দিন ঘনিয়ে এল কিন্তু মুচীর কাছে একটি পয়সাও নেই।

মহাজন বলল, "টাকা ফেরত দাও।" কিন্তু দাও বললেই কি দেওয়া যায়। মুচীর কাছে যে একটা আধলাও নেই।

দিন কেটে যায়। কিন্তু মুচীর অবস্থার আর উন্নতি হয় না। একদিন বনের মধ্যে দেখা হয়ে গেল মহাজনের সঙ্গে। মহাজন তাকে বাগিয়ে ধরে বলল, "টাকা ফেরত দাও।" কিন্তু মুচীর পকেট একেবারে ফাঁকা। মহাজন রেগে গিয়ে টাকার বদলে কিছু জিনিসপত্র চাইল। কিন্তু মুচীর কিই বা আছে ?

মুচী অনেক অনুনয়-বিনয় করে কিছু সময় চাইল। কিন্তু

টাকাওলা লোকেদের সঙ্গে কি আর মিটমাট হয়? মহাজন কোন কথা না শুনে নখের দুই খোঁচায় মুচীর চোখ দুটো উপড়ে নিয়ে বাড়ি চলে গেল হাসতে হাসতে।

বেচারা মুচী চোখ হারিয়ে বনের মধ্যেই রয়ে গেল। কোথায় যাবে বসে বসে সে ভাবে আর ভাবে—কাঁদে আর কাঁদে। শীত শীত করে উঠতেই সে বুঝতে পারল রাত হয়ে গেছে, নেকড়ের ডাক শোনা যাচ্ছে। নেকড়ে ছিঁড়ে খাবে এই ভয়ে সে কোনরকমে রাত কাটাবার জন্য একটা গাছে উঠে পড়ল। একটা ডালে বসে বসে মুচী তার দুর্ভাগ্যের কথাই ভাবতে লাগল।

হঠাৎ ঐ গাছের তলায় একটা খরগোস্, একটা নেকড়ে আর একটা ভাল্লুক এসে গল্প করতে শুরু করে দিল। তারা কি দেখেছে আর শুনেছে এই সব কথাই তারা আলোচনা করছিল।

খরগোস বলল, "আহা, আজ রাজামশাইকে দেখলাম। তাঁর মেয়ে অনেক দিন ধরে ভীষণ অসুখে ভুগছে, মনে তাঁর সুখ নেই তাই। কেউই রাজকন্যাকে ভাল করতে পারেনি। সারানো তো দূরের কথা রোগ ধরতেই কেউ পারছে না। রাজকুমারী কথা বলতে পারে না, দাঁড়াতেও পারে না এমন কি হাত নাড়তেও পারে না। রাজার মন এত খারাপ যে আমি তাঁর সামনে দিয়ে দৌড়ে গেলুম অথচ তিনি আমা[illegible] কিছু করলেন না।"

এই শুনে ভাল্লুক বলল, "চালাকী করলে কি আ[illegible] রাজকুমারী ভাল হবে। ভোরবেলা সূর্যের আলো পড়বা[illegible] সঙ্গে সঙ্গে আপেল গাছ থেকে তিনটে আপেল ছিঁড়তে হবে—

একটা সোনার, একটা রূপোর আর একটা হীরের। এই আপেলগুলো কেটে তার বীজগুলো রাজকুমারীকে খেতে দিলে তবেই রাজকুমারী ভাল হবে। সোনালী বীজ খেলে কথা বলবে, রূপোলী বীজ খেলে দাঁড়াতে পারবে আর হীরের বীজ খেলে একেবারে সেরে যাবে।"

তখন নেকড়ে বলল, "পাশের শহরের লোকগুলোকে আজ দেখলুম। সব বন থেকে জল আনতে যাচ্ছে। শহরের মধ্যে সব কুয়োর জল শুকিয়ে গেছে। কেন কে জানে? গরু-ভেড়াগুলোরও ভীষণ অসুবিধা হয়েছে—আমার বেশ ভালই হয়েছে।"

—"এঃ হে!" খরগোস এবার বলছে, "লোকগুলো যদি ভাল করে দেখত তা হলেই বুঝতে পারত কেন কুয়োগুলো শুকিয়ে গেছে। ঐ শহরে একটা ভাঙা মিনার আছে। মাটিতে অনেকখানি বসে গেছে মিনারটা। জল যেখান থেকে আসে তার উপরই মিনারের চাপ পড়েছে। ওটাকে চার টুকরো করে ফেলতে পারলেই আবার জল পাওয়া যাবে।"

তখন ভাল্লুক বলল, "ওসব থাক। আজ একটা লোক আর একটা লোকের চোখ উপড়ে নিয়েছে তা জান? কেমন করে বেচারা চোখ ফিরে পাবে কে আর জানে!"

হেসে উঠে নেকড়ে বলল, "আমি জানি। লোকটা যদি সূর্য উঠবার আগেই চোখের গর্ত দুটোয় শিশির ঢেলে দিতে পারে তবে আবার সে দেখতে পাবে।"

এমনি ভাবে কথা বলে বলে শেষে তারা চলে গেল। মুচী সব কথা শুনেছে। এদের কথা কি সত্যি? কে জানে? কাল ভোরেই দেখতে হবে সত্যি কিনা—এই সে ভাবছে।

কিন্তু ভোর হবে কখন? চোখে দেখতে পায় না তো সে। হঠাৎ একটা পাখি কিচিরমিচির করে উঠল—তারপর সব পাখিগুলোই গান শুরু করল। নিশ্চয়ই ভোর হবে এবার। মুচী গাছ থেকে কোনক্রমে নেমে পুরু ঘাসের উপর এল। ছুঁয়ে সে বুঝতে পারল রাতে অনেক শিশির জমেছে। আঁজলা ভরে শিশির তুলে সে চোখ ধুতে লাগল। আরে ওমা, সে যে আবার দেখতে পাচ্ছে! আনন্দের চোটে সে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরা তো ঠিকই বলেছে।"

এমন সময় সূর্য উঠল। সূর্যের প্রথম আলো আপেল গাছে পড়েছে। সোনার, রূপোর আর হীরের আপেলগুলো ঝিকমিক করছে, সবগুলো তুলে নিয়ে মুচী ভাবল ওদের একটা কথা যখন ঠিক হয়েছে—বাকীগুলোও হবে, লোকেদের অনেক উপকার করা যাবে।

যে শহরের সব জল শুকিয়ে গেছে প্রথমে মুচি সেখানেই গেল। সবাই খুব মুষড়ে পড়েছে সেখানে—ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত জল পাচ্ছে না।

মুচী জিজ্ঞাসা করল, "তোমাদের পুরনো মিনারটা কোথায় বলতে পার?"

সকলে তাকে মিনারটা দেখিয়ে দিতেই সে বলল, "তোমরা যদি জল চাও তবে ঐ মিনারটাকে চার টুকরো করে ফেল ভেঙ্গে।"

লোকেরা তাই করল। মিনার ভেঙ্গে পড়তেই আকাশ ধুলোয় ধুলো হয়ে গেল আর মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল মিষ্টি জল—কুয়োভর্তি ঠাণ্ডা জল। সব লোকেরা এত খুশী হল যে বলাই যায় না। কেমন করে মুচিকে ধন্যবাদ দেবে বা তাকে

নিয়ে কি যে করবে তারা ভেবেই পায় না। তারা জল খায় আর নাচে, নাচে আর জল খায়। ওদিকে, মুচী চলল রাজপ্রাসাদে।

—"রাজা মশাই, রাজকন্যাকে আমি একবার দেখব, সারাতে পারি ভাল, না পারি তো আমায় শাস্তি দেবেন যা খুশী।"

চাকরেরা তাকে রাজকন্যার কাছে নিয়ে গেল। ভীষণ দুর্বল আর রোগা হয়ে গেছে রাজকুমারী। আপেলগুলো বার করে মুচী। সোনালী বীজগুলো রাজকন্যাকে দেয়। খেয়েই রাজকন্যা যেন ঘুম ভেঙ্গে বলে, "ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ'।"

মুচী তখন রূপোর বীজগুলো দিল। রাজকন্যা খেয়েই এবার দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।"

তখন মুচী হীরের আপেলের বীজগুলো খেতে দিল। রাজকন্যা একদম সেরে গিয়ে মুচীর হাত নিজের হাতে নিয়ে বলল হাসতে হাসতে, "ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।"

রাজা কেমন খুশী হলেন সে আর কি বলব। তিনি বললেন, "আমার জামাই হও তুমি! রাজকন্যাকে মরণের হাত থেকে তুমিই ফিরিয়ে এনেছ।"

মুচী হেসে বলল, "মহারাজ, আপনার কথা শুনে আমার আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু আমার সংসার আছে, বাড়িতে আমার ছেলেমেয়ে রয়েছে।"

সুতরাং রাজামশাই তাকে অনেক ধনদৌলত দিয়ে ছেড়ে দিলেন। মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে মুচী বাড়ির দিকে চলতে লাগল।

বনের মধ্যে ঢুকেই কিন্তু দেখা মহাজনের সঙ্গে। শহরে শুয়োর বিক্রি করতে যাচ্ছিল সে। মুচীকে দেখে তো তার চোখ কপালে উঠল। মুচীও তাকে দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি পকেট থেকে মোহর বার করে তার দেনা শোধ করে দিল। কিন্তু দেনাটেনা তখন মহাজনের কাছে কিছুই নয়। সে ছিনে জোঁকের মত মুচীকে চেপে ধরল, কি করে সে চোখ ফিরে পেয়েছে আর টাকা রোজগার করেছে তাই বলবার জন্য।

লুকোবার কি আছে আর মুচীর? সে যা যা ঘটেছিল সব বলে দিল।

মহাজন হিংসেয় মরে মুচীর সৌভাগ্যের কথা শুনে। রাতে সেও বনের মধ্যে ঠিক আগের জায়গায়টায় গিয়ে মুচীর গাছটায় বসে রইল। বসেই আছে, বসেই আছে। শেষে গাছতলায় খরগোস, নেকড়ে আর ভাল্লুক সেদিনও এসে উপস্থিত। কিন্তু সেদিন কথাবার্তা হবার আগেই রাগারাগি শুরু হয়ে গেল। খরগোস বলল, "আজ রাজাকে খুব খুশী দেখলুম। রাজা আর সব শিকারীরা বন তোলপাড় করছে শিকারের জন্য। রাজকন্যা সেরে গেছে। এবার শিকারীদের হাতেই মরব আমরা।"

নেকড়ে বলল, "আজ শহরে গিয়েছিলুম। লোকগুলো একেবারে পাল্‌টে গেছে, চেনাই যায় না। যেই একটা ঘোড়ার কাছাকাছি গেছি অমনি সকলে চারধার থেকে আমায় তাড়া করল। কোনরকমে প্রাণ নিয়ে বেঁচেছি।"

ভাল্লুক গম্ভীরভাবে বলল, "সেই লোকটাকে আজ দেখলুম, সেই যার চোখ উপড়ে ফেলেছিল। দেখি বেশ হেঁটে যাচ্ছে, চোখও ঠিক হয়ে গেছে।"

সকলে মিলে পরস্পরকে গোপন কথা বলে দেবার জন্য গাল দিতে লাগল। 'তোমার জন্যই হয়েছে', 'তুমিই দোষী' এমনি সব আওয়াজে বন কেঁপে উঠল। দুর্বলরাই শেষে সব সময় দোষী সাব্যস্ত হয়। এদের বেলায়ও নেকড়ে আর ভাল্লুকে ঠিক করল খরগোসই দোষী আর সেজন্য তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হবে। যতই খরগোস বেচারা বলে সে একবিন্দুও কিছু কাউকে বলেনি কিন্তু কিছুই হয় না। হঠাৎ পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সে উপর দিকে তাকিয়েই দেখে মহাজন বসে গাছের ডালে।

—"দেখ, দেখ, আসল দোষী কে", খরগোস বল্‌ল।

—"না, না, আমি নই, আমি নই", মহাজন চেঁচাতে আরম্ভ করল। হঠাৎ ভয় পেয়ে টাল সামলাতে না পেরে সে গাছ থেকে একেবারে নীচে পড়ে গেল।

তারপর কি হল? সে অনেক বড় গল্প। অবশ্য একটা কথা ঠিক—মহাজন আর বাড়ি ফিরে আসে নি।

জমিদারের বিচার

ছোট্ট এক মোরগ আর এক মুরগীর ছানা একদিন একটা বাদাম গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। মোরগটা হঠাৎ গাছে উঠে বাদাম ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুরগীর ছানাটাকে মারতে লাগল। প্রথমটা ছুঁড়ল, লাগল না; দ্বিতীয়টা ছুঁড়ল, গায়ে পড়ল; তৃতীয়টা ছুঁড়ল, আর সেটা একেবারে লাগল গিয়ে সটান বেচারার চোখে।

ভয় পেয়ে মোরগ তড়াক করে নেমে এসে বাচ্চাটাকে সান্ত্বনা দিতে গেল। কিন্তু সে কর্ণপাত না করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে চলল।

পথে ছানাটার দেখা হল জমিদারের সঙ্গে। জমিদার তাকে থামিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে?"

মোরগছানা বলল মোরগ তাকে বাদাম ছুঁড়ে মেরেছে।

—"কে মেরেছে?" জমিদার জিজ্ঞাসা করলেন।

—"ছোট্ট মোরগটা।"

—"বটে। ওকে নিয়ে আয় আমার দুর্গে।"

মোরগ আসামী। এসে হাজির হল।

জমিদার বললেন, "কেন তুই মোরগছানাকে মেরেছিস?"

—"না হুজুর। আমি কি মারতে পারি? গাছে আমি ...তুই নাড়ানাড়িতে বাদামটা খসে গিয়ে লেগেছে ওর ...খ।" বলে মোরগ।

—"বটে, তবে বাদাম গাছটাকে নিয়ে আয় আমার ...ছে।"

বাদাম গাছ এল।

জমিদার বললেন, "কেন তুই নড়লি? তোর জন্যই বেচারা মোরগছানার চোখে বাদাম পড়েছে।"

—"না হুজুর। আমি কি করেছি? পাশের বাড়ির ছাগলটাই তো আমার গুঁড়ির ছাল ছাড়িয়ে আমাকে দুর্বল করে দিয়েছে।"

—"তাই নাকি? তবে নিয়ে আয় ছাগলটাকে।"

ছাগল এল।

ভুরু কুঁচকে জমিদার বললেন, "এই গাছের ছাল খেয়েছিস কেন? তুইই হচ্ছিস আসল দোষী।"

—"না হুজুর। আমি কি করব? রাখাল আমায় ঘাস দেয়নি কেন?"

—"তবে রাখালকেই আন্।"

রাখাল এল।

—"এই, তুই ঘাস দিস্ না কেন রে ছাগলকে? তোর জন্যই বেচারা মোরগছানার চোখে লাগল।" লাঠি বাগিয়ে জমিদার বললেন।

—"আমি কি জানি! ইচ্ছা করে কি আর ঘাস দিইনি? আমার মনিবনী বলেছিলেন আমাকে বিকেলবেলা ভাল জলখাবার দেবেন; কিন্তু দেননি। খিধে পেলে আমি কেমন করে খালি পেটে ছাগল চরাই বলুন?"

—"তবে মনিবনীকে নিয়ে আয়।"

মনিবনী এল। জমিদার লাঠি ঠকঠক করে ওঠেন।

—"কেন তুমি জলখাবার দাওনি রাখালকে? তোমা ই বেচারা মোরগছানার এই বিপদ।"

—"আমি কি করব জমিদার মশাই। আপনিই তো হুকুম দিয়েছেন চাকর-বাকরদের যেন বেশী না খেতে দিই।"

এখন আর জমিদারের কাছে কে কৈফিয়ত চাইবে? জমিদারের বিচারের জন্য তো আর আদালত নেই। কাজে-কাজেই ব্যাপারটার এখানেই শেষ হল।

তারপর?

আমার বাগানে একটা বিরাট ঝাঁকড়া-মাকড়া ওক গাছ আছে—তার নটা বড় বড় ডাল।

ঐ গাছটার তলায় মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ আমি ঝাঁপিটা পেয়েছিলাম—সোনার ঝাঁপি, তার ডালাটা রূপোর। ঝাঁপিটা খুঁড়ে বার করে আমি ডালাটা খুললুম। মধ্যে ছিল একতাড়া গল্প।

পড়ে পড়ে, পাতার পর পাতা খুলে শেষে সব শেষ হয়ে গেল।

গল্পের পর গল্প, একটার পর একটা বল্লে বলে এতক্ষণে সব বলা হয়ে গেল।

আর কেউ কি এর বেশী কিছু জান? যদি জান তবে বল, শুনি। তারপর······?